POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

আল্লাহ্‌র বাণী

اَفَغَيۡرَ دِيۡنِ اللّٰهِ يَبۡغُوۡنَ
وَلَهٗۤ اَسۡلَمَ مَنۡ
فِى السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ
طَوۡعًا وَّكَرۡهًا وَّاِلَيۡهِ يُرۡجَعُوۡنَ○

অতঃপর, তাহারা কি আল্লাহ্‌র দ্বীনের পরিবর্তে অন্য কিছু চাহে, অথচ আকাশ সমূহে এবং পৃথিবীতে যে কেহ আছে সকলেই ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং তাহাদের সকলকেই তাঁহার নিকট প্রত্যাবর্তিত করা হইবে?

(আলে ইমরান: ৮৪)

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ نَحۡمَدُهٗ وَنُصَلِّيۡ عَلٰى رَسُوۡلِهِ الۡكَرِيۡمِ وَعَلٰى عَبۡدِهِ الۡمَسِيۡحِ الۡمَوۡعُوۡدِ
وَلَقَدۡ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدۡرٍ وَّاَنۡتُمۡ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 4

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 20

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 16 মে, 2019 10 রমযান 1440 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

আমাদের পূর্ণ পথ প্রদর্শক (সা.)-এর সাহাবারা খোদা ও তাঁর রসুলের জন্য কি অসাধারণ ত্যাগ স্বীকারই না করেছেন- দেশান্তরিত হয়েছেন, অত্যাচারিত হয়েছেন, একের পর এক বিপদাপদের সম্মুখীন হয়েছেন, নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, অথচ সততা ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে ক্রমশ অগ্রসর হতে থেকেছেন। কোন জিনিস তাদেরকে এমন নিবেদিত প্রাণ করে তুলল। সেটি হল অকৃত্রিম ঐশী প্রেমের উদ্দীপনা যার কিরণ তাদের বক্ষ ভেদ অন্তরকে আলোকিত করেছিল। তাঁর শিক্ষা, আত্মার শুদ্ধিকরণ, অনুসারীদেরকে জগত বিমুখ করে তোলা বা বীরত্বের সঙ্গে সত্যের জন্য নিজেদের রক্ত বইয়ে দেওয়া- এই সমস্ত কিছুর ক্ষেত্রেই অন্য যে কোনও নবীর সঙ্গেই তাঁর তুলনা হোক না কেন, তিনি ছিলেন অনন্য ও অতুলনীয়।

বাণীঃ হযরত মসীহ মওউদ (আ.)

আঁ হযরত (সা.) এবং সাহাবাগণের মর্যাদা

যে বিশ্বস্ততা ও পবিত্রতা আঁ হযরত (সা.) এবং তাঁর সাহাবাগণ প্রদর্শন করেছেন তার তুলনা পাওয়া যায় না। তাঁরা প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করতে দ্বিধাগ্রস্ত হন নি। হযরত ঈসা (আ.)- এর কাজ কঠিন কাজ ছিল না, বা তার কোন অনুগামী ইলহামের ধারণাকেও নস্যাত করেনি। স্বজাতির কয়েকজন ব্যক্তিকে বোঝানো কোন কঠিন কাজ নয়। ইহুদীরা তো ইতিপূর্বেই তওরাত পড়েছিল, তারা ঈমানও এনেছিল। খোদা তা'লাকেও এক-অদ্বিতীয় হিসেবে জ্ঞান করত। তাই অনেক সময় মানুষের মনে এই চিন্তার উদয় হয় যে, তবে কোন কাজটাই বা মসীহ করতে এসেছিলেন? ইহুদীদের মধ্যে এখনও একত্ববাদের জন্য আত্মাভিমান রয়েছে। খুব বেশি হলে কেউ বলতে পারে যে, তাদের মধ্যে কিছু চারিত্রিক ত্রুটি বিচ্যুতি দেখা দিয়েছিল, কিন্তু এর প্রতিকারের জন্য শিক্ষা তো তওরাতেই ছিল। তাঁর জাতি তওরাতের জ্ঞান রাখত। এই সুবিধা থাকা সত্ত্বেও তিনি একজন শিক্ষকের কাছে সেই গ্রন্থ থেকে পাঠ নিয়েছিলেন। কিন্তু এর মোকাবেলায় আমাদের নবী (সা.) সম্পূর্ণ নিরক্ষর ছিলেন। অথচ তাঁর কোন শিক্ষকও ছিলেন না। আর এটি এমন এক সত্য যে বিরোধীরাও এবিষয়টিকে অস্বীকার করতে পারে নি। অতএব, হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্য দুটি সহজসাধ্যতা ছিল। এক, তারা ছিল স্বজাতির মানুষ। সব থেকে বড় বিষয় যেটি তাদেরকে বিশ্বাস করাতে হত, তার উপর তারা পূর্বেই ঈমান এনেছিল। কিছু নৈতিক ত্রুটি বিচ্যুতি অবশ্যই ছিল, কিন্তু এত সুবিধা থাকা সত্ত্বেও শিষ্যদের সংশোধন হয় নি। তারা লোভীই থেকে যায়। হযরত ঈসা (আ.) নিজের কাছে যে অর্থকড়ি রাখতেন, তা থেকে কিছু শিষ্য চুরিও করতেন। তারা বলে, এমনই একটি ঘটনা হল, মসীহ বলেন,- ' আমার মাথা রাখার স্থান নেই।' কিন্তু এমন কথার অর্থ কি তা আমার মনে বিস্ময় জাগায়, যখন কিনা তাঁর কাছে ঘরবাড়িও ছিল এবং অর্থের প্রাচুর্যও ছিল, এতটাই যে কেউ তা থেকে কিছুটা অংশ চুরি করলে বোঝাও যায় না। যাইহোক এই কথাটি প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা হল। মূল বিষয় হল যাবতীয় সুযোগ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও কোনও সংশোধনই হয় নি। পিটার বেহেশতের চাবিকাঠি পেয়ে গেলেও, নিজের গুরুকে অভিশাপ দিতে কুণ্ঠিত হয় নি।

এর বিপরীতে ন্যায়ের দৃষ্টি দিয়ে দেখা হলে উপলব্ধি করা যাবে যে, আমাদের পূর্ণ পথ প্রদর্শক (সা.)-এর সাহাবারা খোদা ও তাঁর রসুলের জন্য কি অসাধারণ ত্যাগ স্বীকারই না করেছেন- দেশান্তরিত হয়েছেন, অত্যাচারিত হয়েছেন, একের পর এক বিপদাপদের সম্মুখীন হয়েছেন, নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, অথচ সততা ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে ক্রমশ অগ্রসর হতে থেকেছেন। কোন্ জিনিস তাদেরকে এমন নিবেদিত প্রাণ করে তুলল? সেটি হল অকৃত্রিম ঐশী প্রেমের উদ্দীপনা যার কিরণ তাদের বক্ষ ভেদ অন্তরকে আলোকিত করেছিল। তাঁর শিক্ষা, আত্মার শুদ্ধিকরণ, অনুসারীদেরকে জগত বিমুখ করে তোলা বা বীরত্বের সঙ্গে সত্যের জন্য নিজেদের রক্ত বিসর্জন দেওয়া- এই সমস্ত কিছুর ক্ষেত্রেই অন্য যে কোনও নবীর সঙ্গেই তাঁর তুলনা হোক না কেন, তিনি ছিলেন অনন্য ও অতুলনীয়। এটিই আঁ হযরত (সা.)-এর সাহাবাগণের মর্যাদা, তাঁদের মধ্যে যে পারস্পরিক ভালবাসার বন্ধন ছিল তার চিত্র দুটি বাক্যে তুলে ধরা হয়েছে।

وَاَلَّفَ بَيۡنَ قُلُوۡبِهِمۡ لَوۡ اَنۡفَقۡتَ مَا فِى الۡاَرۡضِ جَمِيۡعًا مَّاۤ اَلَّفۡتَ بَيۡنَ قُلُوۡبِهِمۡ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيۡنَهُمۡ

অর্থাৎ তিনিই তাহাদের হৃদয়গুলির মধ্যে সম্প্রীতির সঞ্চার করিলেন। যদি তুমি ভূপৃষ্ঠে যাহা কিছু আছে সব খরচ করিতে তথাপি তুমি তাহাদের হৃদয়গুলির মধ্যে সম্প্রীতির সঞ্চার করিতে পারিতে না, কিন্তু আল্লাহ্ তাহাদের মধ্যে সম্প্রীতি সঞ্চার করিয়াছিলেন। (আনফাল-৬৪)

অর্থাৎ তাদের মধ্যে যে প্রেম-বন্ধন রয়েছে, সেটি কখনই সৃষ্টি হত না, স্বর্ণের পাহাড় ব্যয় করা হলেও। এখন অপর দলটি হল প্রতিশ্রুত মসীহ্-র যারা নিজেদের মধ্যে সাহাবাদের ন্যায় বৈশিষ্ট তৈরী করবে। সাহাবারা ছিলেন সেই পবিত্র জামাত যাদের প্রশংসায় কুরআন পরিপূর্ণ। আপনারাও কি তাঁদের মত? খোদা বলেন, মসীহ-র সঙ্গে সেই সমস্ত মানুষ থাকবেন যারা সাহাবাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এক সারিতে দাঁড়াবেন। সাহাবা তারাই ছিলেন যারা নিজেদের সম্পদ ও মাতৃভূমিকে সত্যের পথে উৎসর্গ করেছেন। তারা সমস্ত কিছুই ত্যাগ করেছেন। হযরত আবু বাকার (রা.)-এর ঘটনা হয়তো প্রায় লোকেই শুনেছে। একদা যখন মানুষকে খোদার পথে সম্পদ উৎসর্গ করার নির্দেশ দেওয়া হয়, তিনি তখন ঘরের সব কিছু উজাড় করে নিয়ে আসেন।

এরপর ৮এর পাতায়.....

১২৫ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) ২০১৯ সালে কাদিয়ানে অনুষ্ঠিতব্য জলসা সালানার জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল ২৭, ২৮ ও ২৯ শে ডিসেম্বর ২০১৯ (যথাক্রমে- শুক্র, শনি ও রবিবার)। আশিসমণ্ডিত এই জলসায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে জামাতের সদস্যগণ এখন থেকেই প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন আর পাশাপাশি দোয়াও করুন যেন আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করেন। এই জলসা সালানা যেন সার্বিকভাবে সফল ও আশিসমণ্ডিত হয়, এবং সৎ প্রকৃতির মানুষের হেদায়েতের কারণ হয়, সেই উদ্দেশ্যে দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্ ওয়া আহ্‌সানুল জাযা। (নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাজিয়া, কাদিয়ান)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর জার্মান সফর, অক্টোবর, ২০১৮

এডেম ভেজসেলোভ সাহেব লেখেন: আমরা জলসায় অংশগ্রহণ করার উদ্দেশ্যে মেকডোনিয়া থেকে বাসে করে যাত্রা আরম্ভ করি। মাঝে মধ্যে বিরতি দিয়ে যাত্রা বেশি ভালই ছিল। জলসার উদ্বোধনীতে পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানটি আমার খুব ভাল লেগেছে। হুযুর আনোয়ার সেই ভাষণটিতে ইসলামী শিক্ষাকে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন, যে ভাষণে তিনি আহমদীদেরকে তাদের দায়িত্বাবলী এবং জামাতের উদ্দেশ্য বর্ণনা করছিলেন। জলসার তিনটি দিনই আমি সমস্ত ভাষণ শুনেছি। আমার মনে হচ্ছে যেন, এতদিনে আমি জানতে পারলাম যে প্রকৃত মুসলমান কেমন হওয়া উচিত এবং একজন মুসলমানকে অ-মুসলিমদের সঙ্গে কেমন সম্পর্ক রাখা দরকার। এই জলসা আমাকে অনেক কিছু শেখার সুযোগ দিয়েছে।

একজন অতিথি প্রশ্ন করেন যে, খলীফা হিসেবে আপনার কাজ অত্যন্ত কঠিন। কিভাবে আপনি এই কাজ করতে সক্ষম হন? এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আল্লাহ্ তা'লার এর জন্য শক্তি দান করেন। এই কাজ মানবীয় প্রচেষ্টায় সম্ভব নয়। আল্লাহ্‌র কাজ আল্লাহ্‌ই করতে সাহায্য করেন। এরা তো পাঁচ দিন কাজ করে দুই দিন ছুটি কাটায় বা ছয় দিন কাজ করে একদিন ছুটি নেয়। কিন্তু আমার কোন ছুটি নেই।

এক অতিথি প্রশ্ন করেন: বর্তমানে পাকিস্তানে ইমরান খানের সরকার ক্ষমতায় এসেছে। এরফলে কি আহমদীদের অবস্থার উন্নতি ঘটবে? এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: ১৯৭৪ সালে জাতীয় সংসদে এই মর্মে একটি আইন প্রণীত হয় যে, আহমদীরা মুসলমান নয়। পরবর্তীতে যিয়াউল হক এই আইনে আরও কিছু সংযোজন করে যে, আহমদীদের কোন কণ্ঠ থাকবে না, আহমদীরা নিজেদেরকে মুসলমান বলে পরিচয় দিতে পারবে না, পরস্পরকে সালাম করতে পারবে না, বিসমিল্লাহ পাঠ করতে পারবে না, এবং অনুরূপভাবে আরও এমনই সব অদ্ভুত ও বিদ্ঘুটে আইন কানুন রয়েছে। এই আইন যতদিন বলবৎ আছে ক্ষমতায় আসা সরকার কিছুই করতে পারবে না, কেননা, এই আইনের কারণেই মোল্লাদের প্রবল প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হুযুর আনোয়ার বলেন: যতদূর ইমরান খানের সম্পর্ক, তাকেও এই আইন অনুসারেই সরকার চালাতে হবে, কেননা, মৌলবীদের প্রভাব রয়েছে। সম্প্রতি তিনি অর্থনীতির উন্নতিকল্পে একটি উপদেষ্টা কাউন্সিল গঠন করেছিলেন। সেই কাউন্সিলে বিশ্বের তাবড় অর্থনীতিবিদদের অন্যতম এক আহমদী সদস্যও স্থান পেয়েছিলেন, যিনি বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষা দান করেন। তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় মোল্লারা এই বলে বিতন্ডা সৃষ্টি করে যে কাদিয়ানীকে এর মধ্যে রাখা হয়েছে আর আমরা তো মোটেই বরদাস্ত করব না। যদিও প্রথমে ইমরান খানের মন্ত্রীরা একথার উপর জোর দেন যে , আমরা তো তাকে কোন ইসলাম সংক্রান্ত কোন কাউন্সিলের মধ্যে রাখি নি। বরং তাঁকে অর্থনীতির উন্নতির জন্য গঠিত একটি কমিটির সদস্য করেছি। কিন্তু মোল্লাদের সে কথা মনোপুত হয় নি। অবশেষে ইমরান খানের সরকারকে মৌলবীদের সামনে নতজানু হতে বাধ্য হয়। এরপর তারা সেই অর্থনীতিবিদকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেন। আপাতত এটিই ইমরান খানের সরকারের ন্যয়পরায়ণতার জলন্ত উদাহরণ যা আমরা প্রত্যক্ষ করছি।

আলবেনিয়ার প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাত

এক অতিথি বলেন: আমার এখানে জলসায় আসার দুটিই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এক, আমার দুই পুত্র বয়আত করেছে। আমি দেখতে চাইছিলাম যে তারা কোথায় গিয়েছে আর জলসা দেখার ইচ্ছাও ছিল। দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি হল, জার্মানী একটি উন্নত দেশ। এই দেশটি দেখারও বাসনা ছিল। এখানে এসে দেখলাম যে, আমার ছেলেদের নিয়ে কোন চিন্তার কারণ নেই। তারা দুজনেই সঠিক স্থানে এসেছে। তারা আপনাদের জামাতের সদস্য। আমিও খুব শীঘ্রই এই জামাতের সদস্য হব। তিনি বলেন, আমরা এমন এক স্থান থেকে এসেছি যেখানে ষাট বছর পর্যন্ত ধর্মের উপর নিষেধাজ্ঞা ছিল। এখন নতুন প্রজন্ম ধর্ম গ্রহণ করেছে। পুরোনো প্রজন্মগুলিকে কিছুটা সময় লাগছে। সাম্যবাদের কারণে এখানে ধর্মের উপর নিষেধাজ্ঞা ছিল। তাই তাদের পিতা এখনও পর্যন্ত আহমদীয়াত গ্রহণ করতে পারে নি। যা শুনে হুযুর আনোয়ার বলেন: আল্লাহ্ কৃপা করুন।

পেশায় উকিল আলবেনিয়া থেকে আগত এক ভদ্রমহিলা বলেন: আমি আলবেনিয়া জাামাতের নিয়ম কানুনের বিষয়ে কাজ করেছি। এখন আমি জলসা দেখতে এসেছি। জলসার ব্যবস্থাপনা খুবই উন্নত মানের ছিল। এত মানুষের সমাবেশ, অথচ কোথাও কোন ভুলত্রুটি চোখে পড়ল না। মনে হচ্ছিল যেন, মৌমাছির বাসা। প্রত্যেকটি জিনিস নির্দিষ্ট রাখা ছিল। যেভাবে মানুষ খলীফার পিছনে একত্রে নামায পড়ছিল আর তারা ক্রন্দনরত ছিল, সেই দৃশ্য আমাকে অভিভূত করেছে। আমি আশা করি, খোদা তা'লার সাহায্যক্রমে শীঘ্রই এই জামাতের অংশ হব।

আলবেনিয়ার এক আহমদী বলেন: ২০০৪ সালে বয়আত গ্রহণ করে আমি জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছি। আমি পেশায় একজন সাংবাদিক। জলসা সালানা আমার জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্ট। এটি আমার জন্য এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, এবছর আমি আগস্ট পর্যন্ত এক পত্রিকায় কাজ করছিলাম, সেই কাজ আমি ছেড়ে দিই এবং এর কাজের সন্ধান করলে তিন চারটি প্রস্তাব আসে। কিন্তু আমি তাদেরকে প্রত্যেককে একথাই বলেছি যে, আমাকে কাজে রাখতে হলে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আমার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। কেননা, আমার একটি অবশ্য পালনীয় কাজ আছে যার উপর আমি এই কাজকে অগ্রাধিকার দিতে পারি না। আর সেই অবশ্য পালনীয় কাজটি হল জলসা সালানায় অংশগ্রহণ করা। তাই আমি জলসা সালানায় এসেছি। আমি আশা করি, ফিরে গিয়ে কোন কোন কাজ অবশ্যই পেয়ে যাব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মানুষ যদি পরিশ্রম করে, তবে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় অবশ্যই সে কোন কাজ পেয়ে যায়। যাইহোক আমি জলসায় অংশগ্রহণ করেছি। এই জলসা আমার জন্য এক অসাধারণ অনুষ্ঠান। এই তিনটি দিনই আমাকে মন্ত্রমুগ্ধের মত বেঁধে রেখেছিল। আমার দৃষ্টিতে জলসা সালানা হল একটি আধ্যাত্মিক আহার, আপ্রান চেষ্টা করে হলেও যার জন্য আমাকে প্রত্যেক বছর এখানে আসা উচিত। জলসা ছাড়াও চতুর্থ দিনে হুযুরের সঙ্গে যে এখানে সাক্ষাত অনুষ্ঠান থাকে, কয়েক মিনিটের হলেও, তা এক বিশেষ গুরুত্ব দাবি করে। সাক্ষাত অনুষ্ঠানে আমরা নিজেদের প্রভুর সঙ্গে বসে বরকত অর্জন করে থাকি। আল্লাহ্ তা'লার কাছে এই দোয়াই করি যে, তিনি যেন আমাকে আগামী বছর যুক্তরাজ্যের জলসাতেও অংশগ্রহণের তৌফিক দান করেন। আমি একথাও যোগ করতে চাই যে, জলসা প্রতি বছর উন্নতির পথে অগ্রসর হচ্ছে।

হাঙ্গেরী ও ক্রোয়েশিয়ার প্রতিনিধিদলের সঙ্গে সাক্ষাত

এক ভদ্রমহিলা বলেন: এটি আমার জার্মানীতে প্রথম জলসা। এর পূর্বে আমি তিনবার যুক্তরাজ্যের জলসা সালানায় অংশগ্রহণ করেছি। কাদিয়ান জলসাতেও একবার অংশগ্রহণ করেছি। এখানকার জলসার প্রতিটি ব্যবস্থাপনা উৎকৃষ্টমানের ছিল। থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত, পরিচ্ছন্নতা, বক্তব্য-মোটকথা প্রতিটি অনুষ্ঠান সুসংহত ছিল। খোদা তা'লা পর্যন্ত পৌঁছতে হলে আমাদের প্রয়োজন এক 'হাবলুল্লাহ্'-এর। আজ আহমদীয়াতই আমাদেরকে সেই 'হাবলুল্লাহ্' প্রদান করছে। হুযুর আনোয়ারের উপর অনেক চাপের বোঝা রয়েছে। খোদা তা'লা তাঁকে মনোনীত করেছেন। তিনি এই বোঝা অবশ্যই বহন করবেন। আমরা হুযুর আনোয়ারের জন্য দোয়া করি, আল্লাহ্ যেন তাঁর সহায় হন। জলসায় আমি প্রতিটি স্থানে বিভিন্ন জাতির মানুষের সঙ্গে আলাপ করেছি, যারা ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা বলে। সর্বত্রই এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে। যুক্তরাজ্যে উন্মুক্ত স্থানে জলসা হয় আর সেখানে এক অস্থায়ী শহর গড়ে তোলা হয়।

হাঙ্গেরী থেকে আগত এক প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চের পাদ্রী গ্যাবর থমাস সাহেব জলসায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। ধর্মীয় কাজের পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন প্রকার জনকল্যানমূলক কাজেও বেশি সক্রিয়। তিনি নিজের অভিমত ব্যক্ত করে বলেন: আমি একজন খৃষ্টান। কিন্তু আপনাদের জলসায় এসে আমার ঈমান উজ্জীবিত হয়। আর যেন সেখানে সতেজতা লাভ করি। এই উজ্জীবিত হওয়া সারা বছর বিভিন্ন কাজে সহায়ক হয়। তাঁর কারণে কেবল গ্রামেই নয়, বরং তাঁর বন্ধুমহলেও জামাত সম্পর্কে পরিচিতি ঘটেছে এবং জামাতের বাণী পৌঁছনোর নতুন পথ উন্মোচিত হয়েছে।

হাঙ্গেরীর মুবাল্লিগ সিলসিলা লেখেন: কয়েক মাস পূর্বে পাদ্রী সাহেবের মায়ের মৃত্যু হয়। কয়েকজন খুদ্দাম সহ তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রীয়ায় অংশগ্রহণের জন্য গ্রামে পৌঁছি। প্রচন্ড ঠান্ডা ও কুয়াশার কারণে চলার পথ দুর্গম হয়ে ওঠে। আমাদেরকে দেখে তিনি আনন্দিত হন আবার অবাকও হন। দাফন প্রক্রিয়ার পর রীতি অনুসারে গ্রামের কমিউনিটি হলে শোকসভা আয়োজিত হয় যেখানে গ্রামের অনেক মানুষ এবং অন্যান্য এলাকারও কিছু বিশিষ্ট মানুষ উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে গিয়ে তিনি সমস্ত গ্রামবাসীদের সমক্ষে বলেন: আহমদী মুবাল্লেগ এবং আহমদীয়া জামাতই হল আমার প্রকৃত বন্ধু ও হিতৈষী। অসুস্থ কিম্বা দুর্ঘটনায় আহত হয়ে যখন আমি হাসপাতালে ভর্তি ছিলাম, তখন আহমদী জামাতের সদস্যরাই

এরপর ৯ এর পাতায়..

জুমআর খুতবা

শহীদ আল্লাহ্ তা'লার কাছে যাওয়ার পর স্বাধীনভাবে বিচরণ করে।

হযরত মুবাশ্বের বিন আব্দুল মুনযের (রা.) বলেন- আমি জান্নাতে রয়েছি, যেখানে খুশি খেতে পারি। আমি তাঁকে বললাম, আপনি কি বদরে শহীদ হন নি? তিনি বললেন, হ্যাঁ অবশ্যই। কিন্তু আমাকে পুনরায় জীবিত করা হয়েছিল। সেই সাহাবী রসূল করীম (সা.) কে এই স্বপ্নটি শোনালে তিনি (সা.) বলেন- " হে আবু জাবের! এটিই শাহাদত।"

যুদ্ধ এবং শত্রুদের অত্যাচার সত্ত্বেও সাহাবারা নিজেদের বিনোদনের উপকরণও তৈরী করতেন। যৎ সামান্য হলেও পরস্পরকে তারা প্রতিস্পর্ধা জানাতেন, যাতে সময়ও কেটে যায় আর শত্রুদের পক্ষ থেকে অনবরত যে মানসিক চাপ ছিল সেটিও প্রশমিত হয়।

" খুন ও হত্যা করা মহানবী (সা.)-এর উদ্দেশ্য ছিল না"

নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার মূর্তপ্রতীক বদরী সাহাবী

হযরত হুসায়েন বিন হারেস, হযরত সাফওয়ান, হযরত মুবাশ্বের বিন আব্দুল মুনযির, হযরত ওয়ারকা বিন ইয়াস, হযরত মুহরেয বিন নাযলা, হযরত সুয়ায়েত বিন সাদ রাযিআল্লাহু আনহুম ও রাযু আনহু -এর জীবনালেখ্য।

"আল্লাহ্ তা'লা যখন নিজ নবীদের এলহামের মাধ্যমে কোন নির্দেশ প্রদান করেন যে, এটি কর, তখন এর অর্থ হয় আল্লাহ্ তা'লা এর জন্য সাহায্য ও সহযোগিতাও করবেন আর উপকরণেরও ব্যবস্থা করবেন, এভাবে একাজ সম্পন্ন হবে- এটিই আমাদের অভিজ্ঞতা। "

অগ্রপানে আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ অথবা যে উন্নতি আমরা দেখি তা মূলত আল্লাহ্ তা'লার এই পরিকল্পনারই অংশ যা আল্লাহ্তা'লা জগৎময় ইসলামের প্রচারের জন্য হাতে নিয়েছেন।

আল্লাহ্ তা'লা ইসলামাবাদ থেকে ইসলামের প্রচারের কাজকে পূর্বের তুলনায় আরো ব্যপকতা দান করুন। "ওয়াসসে মাকানাকা" কেবল গৃহায়নের ক্ষেত্রে বিস্তৃতির কারণ যেন না হয় বরং আল্লাহ্ তা'লার বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও যেন প্রসারতার মাধ্যম হয়।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর ইলহাম "وَسِّعْ مَكَانَكَ" অনুযায়ী জামাত আহমদীয়ার নতুন মরকয 'ইসলামাবাদ, টিলফোর্ড সারে'-এর নির্মাণ এবং সেখানে স্থানান্তরিত হওয়ার ঘোষণা ইসলামাবাদের নবনির্মাণ প্রকল্প এবং সেখানে স্থানান্তরিত হওয়াকে আল্লাহ্ তা'লা যেন সার্বিকভাবে কল্যাণমণ্ডিত করেন সে জন্য জামাতের সদস্যদের কাছে দোয়ার আহ্বান।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদ থেকে প্রদত্ত ১২ এপ্রিল, ২০১৯, এর জুমুআর খুতবা (১২ শাহাদত, ১৩৯৮ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: আজকে আমি যেসব বদরী সাহাবীর স্মৃতিচারণ করব তাদের মাঝে সর্বপ্রথম নাম হলো হযরত হোসাইন বিন হারেস। তার মা ছিলেন সুখায়লা বিনতে খুযাঈ। তার সম্পর্ক ছিল বনু মুত্তালেব বিন আবদে মানাফ-এর সাথে। তিনি তার দুই ভাই হযরত তোফায়েল এবং হযরত উবায়দার সাথে মদিনায় হিজরত করেন। তাদের সাথে হযরত মিসতা বিন উসাসা এবং হযরত আব্বাদ বিন মুত্তালিবও ছিলেন। মদিনায় তিনি হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন সালামা আজলানী'র ঘরে অবস্থান করেন। রেওয়ায়েত অনুসারে মহানবী (সা.) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জুবায়ের এর সাথে হযরত হোসাইন এর ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেছিলেন। এটি মুহাম্মদ বিন ইসহাকের ভাষ্য। হযরত হোসাইন বদর এবং ওহুদসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.) এর সাথে অংশগ্রহণ করেছেন। হযরত হোসাইন এর দুই সহোদর হযরত উবায়দা এবং হযরত তোফায়েলও বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। হযরত হোসাইন এর মৃত্যু হয়েছে ৩২ হিজরীতে।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩০, দারু আহইয়ায়ুত তুরাসুল আরবী দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯৬) (আল ইসতিয়াব, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৪১, দারুল কুতুবল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত) (উসদুল গাবা, ১ম খণ্ড, পৃ: ৫৭৩, দারুল কুতুবল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত)

তার পুত্রের নাম ছিল আব্দুল্লাহ্। তার দুই কন্যা ছিলেন- খাদিজা এবং হিন্দ, তারাও ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। খায়বারের যুদ্ধের সময় মহানবী (সা.) তাদের উভয়কে ১০০ ওয়াসাক খাদ্যশস্য প্রদান করেছিলেন।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৩৬৪, দারু আহইয়ায়ুত তুরাসুল আরবী দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯৬)

এক ওয়াসাক ৬০ সা'-এর সমান হয়ে থাকে আর এক সা আড়াই সের এর সমপরিমাণ বা কিছুটা কম হয়ে থাকে। অতএব সেই হিসেবে তাদের পিতার কারণে মহানবী (সা.) তাদেরকে প্রায় ৩৭৫ মন খাদ্যশস্য প্রদান করেছিলেন।

(লুগাতুল হাদীস, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪৮৭, প্রকাশক নুমানি কুতুবখানা লাহোর)

দ্বিতীয় সাহাবী যার আমি স্মৃতিচারণ করব তিনি হলেন, হযরত সাফওয়ান (রা.)। তার পিতার নাম ছিল ওহাব বিন রাবিআ। হযরত সাফওয়ানের ডাকনাম ছিল আবু আমর। তিনি বনু হারেস বিন ফেহের গোত্রের সাথে সম্পর্ক

রাখতেন। তার পিতার নাম ছিল ওহাব বিন রাবিআ। অপর একটি রেওয়ায়েতে তার নাম ওহায়েবও বর্ণিত হয়েছে। তার মায়ের নাম ছিল দাদ বিনতে হাজদাম, যিনি বায়যা নামে পরিচিত ছিলেন। এ কারণেই হযরত সাফওয়ানকে ইবনে বায়যাও বলা হতো। তিনি হযরত সাহাল এবং সোহায়েল এর ভাই ছিলেন। মহানবী (সা.) যে সাহাল এবং সোহায়েল-এর কাছ থেকে মসজিদে নববীর ভূমি ক্রয় করেছিলেন এই দুই ভাই তারা নন। তারা অন্য দুজন ছিলেন। মহানবী (সা.) হযরত রাফে বিন মুআল্লার সাথে হযরত সাফওয়ানের ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেছিলেন। আর অন্য রেওয়ায়েত অনুসারে হযরত সাফওয়ানের ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করা হয়েছিল হযরত রাফে বিন আজলানের সাথে। তার মৃত্যু সম্পর্কেও ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। কেউ কেউ বলে যে, হযরত সাফওয়ানকে বদরের যুদ্ধে তোআয়মা বিন আদী শহীদ করেছিল আর অন্য রেওয়ায়েত অনুসারে তিনি বদরের যুদ্ধে শহীদ হন নি, বরং তিনি বদরের যুদ্ধসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.) এর সাথে অংশগ্রহণ করেছেন। হযরত সাফওয়ান সম্পর্কে রেওয়ায়েতে এসেছে যে, তিনি বদরের যুদ্ধের পর মক্কা ফিরে গিয়েছিলেন। আর কিছুকাল পর পুনরায় মদিনায় হিজরত করেন। তিনি মক্কা বিজয় পর্যন্ত মক্কায় অবস্থান করেছেন বলেও রেওয়ায়েত বিদ্যমান রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) তাকে আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ এর যুদ্ধাভিযানে অন্তর্ভুক্ত করে আকুয়া অভিমুখে প্রেরণ করেছিলেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে তার মৃত্যুর সন ১৮, ৩০ বা ৩৮ হিজরী উল্লেখ করা হয়েছে।

(উসদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৩, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেরুত) (আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৩য় খণ্ড ,পৃ: ৩৫৮-৩৫৯, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেরুত, ১৯৯৫) (আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৮, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০)

যাহোক, সব ক্ষেত্রেই এটি প্রমাণিত যে, তিনি বদরী সাহাবী ছিলেন।

পরবর্তী সাহাবী যার স্মৃতিচারণ হবে তিনি হলেন, হযরত মুবাশ্বের বিন আব্দুল মুনযের। হযরত মুবাশ্বেরের পিতার নাম ছিল আব্দুল মুনযের। হযরত মুবাশ্বের এর পিতার নাম ছিল আব্দুল মুনযের আর তার মাতার নাম ছিল নসীবা বিনতে যায়েদ। তিনি অউস গোত্রের বনু আমর বিন অউফ শাখার সদস্য ছিলেন। মহানবী (সা.) হযরত মুবাশ্বের বিন আব্দুল মুনযের এবং হযরত আকেল বিন আবু বুকায়ের এর মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেছিলেন। কেউ কেউ বলেন যে, তিনি (সা.) হযরত আকেল বিন আবু বুকায়ের (রা.) এবং হযরত মুজাযযের বিন যিয়াদ এর মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেছিলেন। যাহোক তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং সেই যুদ্ধেই শাহাদত বরণ করেন। হযরত সায়েব বিন আবু লুবাবা, যিনি হযরত মুবাশ্বের এর ভাই হযরত আবু লুবাবার পুত্র ছিলেন, তার পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) গনিমতের মালে হযরত মুবাশ্বের বিন আব্দুল মুনযের এর অংশ নির্ধারণ করেন আর মাআন বিন আদী আমাদের কাছে তার অংশ নিয়ে আসেন।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৪৭-৩৪৮, দারু আহইয়ায়ুত তুরাসুল আরবী দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০)

অর্থাৎ তার ভাতুষ্পুত্ররা ভাইয়ের অংশ পেয়েছে।

মদিনায় হিজরতের সময় মুহাজেরদের মধ্য থেকে হযরত আবু সালামা বিন আব্দুল আসাদ ও হযরত আমের বিন রাবিআ এবং হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ আর তার ভাই হযরত আবু আহমদ বিন জাহাশ কুবায় হযরত মুবাশ্বের বিন আব্দুল মুনযেরের ঘরে অবস্থান করেন। এরপর মুহাজেরগণ একের পর এক সেখানে আসতে থাকেন।

(আসসীরাতুন নাবুয়াহ লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৩৫৫, দারুল কুতুবল ইলমিয়া, বেরুত, প্রকাশকাল: ২০০১)

হযরত মুবাশ্বের বিন আব্দুল মুনযের তার দুই ভাই হযরত আবু লুবাবা বিন আব্দুল মুনযের এবং হযরত রিফা বিন আব্দুল মুনযেরের সাথে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। হযরত রিফা ৭০জন আনসারের সাথে আকাবার বয়আতে অংশগ্রহণ করেন। একইভাবে বদর এবং ওহুদের যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি ওহুদের যুদ্ধে শহীদ হন। মহানবী (সা.) যখন বদরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন তখন তিনি (সা.) হযরত আবু লুবাবাকে মদিনার আমীর নিযুক্ত করে রওহা নামক স্থান থেকে ফেরত পাঠান। যেভাবে পূর্বেই বলা হয়েছে রওহা মদিনা থেকে ৪০ মাইল দূরে অবস্থিত একটি জায়গার নাম। কিন্তু মহানবী (সা.) তার জন্য গনিমতের মাল এবং পুণ্যে অংশ নির্ধারণ করেছেন। আল্লামা ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন যে, হযরত মুবাশ্বের বিন আব্দুল মুনযের বনু আমর বিন অউফ গোত্রের লোক ছিলেন। তিনি সেসব আনসারী সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা বদরের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেছেন।

(উসদুল গাবা ফি মারেফাতুস সাহাবা, পঞ্চম খণ্ড, পৃ: ৫৩, দারুল কুতুবল ইলমিয়া বেরুত, ২০০৮ সালে প্রকাশিত) (আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৪১, দারু আহইয়ায়ুত তুরাসুল আরবী দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯৬)

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর বিন হারাম বর্ণনা করেন, আমি ওহুদের যুদ্ধের পূর্বে স্বপ্ন দেখি যে, হযরত মুবাশ্বের বিন আব্দুল মুনযের আমাকে বলছেন, তুমি কয়েকদিনের ভেতর আমাদের কাছে চলে আসবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কোথায়। তিনি বলেন, আমি জান্নাতে। আমি জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা পানাহার করি। আমি তাকে বলি যে, আপনি কি বদরের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন নি? তিনি বলেন, হ্যা কেন নয়? কিন্তুআমাকে পুনর্জিবিত করা হয়েছে। সেই সাহাবী মহানবী (সা.)-কে এই স্বপ্ন শুনালে তিনি (সা.) বলেন, হে আবু জাবের শাহাদত এমনই হয়ে থাকে।

(আল মুসতাদরিক আলাস সালেহীন, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৮৪০-১৮৪১)

অর্থাৎ একজন শহীদ আল্লাহ্‌র কাছে যায় এবং সেখানে স্বাধীনভাবে বিচরণ করে।

আল্লামা যুরকানি বদরের যুদ্ধে শাহাদত বরণকারী শহীদদের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, অউস গোত্রের দুই সাহাবী ছিলেন, যাদের একজন ছিলেন হযরত সাদ বিন খায়সামা। কেউ কেউ বলে যে, তোআয়মা বিন আদী তাকে শহীদ করেছে আর কারো কারো মতে আমর বিন আবদে উদ তাকে শহীদ করেছে। সামহুদি তার বই 'ওফা'-তে লিখেছেন যে, জীবনি লেখকদের লেখা থেকে স্পষ্ট যে, হযরত উবায়দা ছাড়া বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীরা বদরেই কবরস্ত রয়েছেন। হযরত উবায়দার মৃত্যু কিছুকাল পর হয়েছিল আর তিনি সাফরা বা রওহা নামক স্থানে সমাহিত রয়েছেন।

তিবরানী নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণনা করেন যে, হযরত ইবনে মাসঊদ থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় মহানবী (সা.) এর সেসব সাহাবী, যাদেরকে বদরের যুদ্ধে শহীদ করা হয়েছে, আল্লাহ্ তাদের আত্মাকে জান্নাতে সবুজ পাখিদের মাঝে স্থান দেবেন। তারা জান্নাতে পানাহার করবে, এমতাবস্থায় তাদের প্রভু তাদের সামনে আত্মপ্রকাশ করবেন এবং বলবেন যে, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা কী আশা কর? তারা বলবে, হে আমাদের প্রভু এর চেয়েও মহান কিছু আছে কী? আমরা তো জান্নাতেই আছি। আল্লাহ্ তা'লা পুনরায় বলবেন যে, তোমরা কী আশা কর? প্রত্যুত্তরে চতুর্থবার সাহাবীরা বলবেন, তুমি আমাদের আত্মাকে আমাদের দেহে ফিরিয়ে দাও, যেন আমাদেরকে পুনরায় সেভাবেই শহীদ করা হয় যেভাবে পূর্বে আমাদের শহীদ করা হয়েছিল।

(শারহুল উলেমা আযযুরকানি, তৃতীয় ভাগ, পৃ: ৩২৭)

পরবর্তী যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো হযরত ওরাকা বিন ইয়াস। হযরত ওরাকা'র নাম সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। তার নাম ওরাকা ছাড়া ওয়াদফা এবং ওয়াদকা-ও বর্ণিত হয়েছে। হযরত ওরাকার পিতার নাম ছিল ইয়াস বিন আমর। তিনি আনসারদের খাযরাজ গোত্রের বনু লোযান বিন গানাম শাখার সদস্য ছিলেন। আল্লামা ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত ওরাকা তার দুই ভাই হযরত রবী' এবং হযরত আমর এর সাথে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণের তৌফিক লাভ করেন। হযরত ওরাকা বদরের যুদ্ধের পাশাপাশি ওহুদ, খন্দক এবং অন্যান্য সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.) এর সাথে অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করেছেন। ইয়ামামার যুদ্ধে হযরত আবু বকরের খিলাফতকালে ১১ হিজরীতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

(আসসীরাতুন নাবুয়াহ লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৪৬৯, দারুল কুতুবল ইলমিয়া, বেরুত, প্রকাশকাল: ২০০১) (উসদুল গাবা, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৪১২-৪১৩, দারুল কুতুবল ইলমিয়া, বেরুত, প্রকাশকাল: ২০০১)

পরবর্তী যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হচ্ছে তার নাম হলো হযরত মুহরেয বিন নাযলা। তার পিতার নাম ছিল আব্দুল্লাহ্। নাযলা বিন আব্দুল্লাহ্ হলেন তার পিতা। অথচ অপর এক বর্ণনা অনুযায়ী তার পিতার নাম ছিল ওহাব। তার উপনাম ছিল আবু নাযলা। তিনি ফর্সা এবং সুশ্রী চেহারার অধিকারী ছিলেন। তার উপাধি ছিল ফুহায়রা। তিনি আখরাম নামেও পরিচিত ছিলেন। তিনি বনু

রসুলের বাণী

خَيْرُ الزَّادِ التَّقْوٰى

তাকওয়াই হল সর্বোত্তম পাথেয়।

দোয়াপ্রার্থী: আজকারুল ইসলাম, জামাত
আহমদীয়া আমাইপুর, বীরভূম

আবদে শামস এর মিত্র ছিলেন। অথচ বনু আব্দু ল আশআল তাকে নিজেদের মিত্র বলে থাকে। অর্থাৎ মুহরেয এবং আখরাম, দুটি নাম ছিল তার। তিনি মক্কার গোত্র বনু গানাম বিন দূদান এর সদস্য ছিলেন। এই গোত্রটি মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। এই গোত্রের পুরুষ এবং মহিলারা মদিনায় হিজরতের তৌফিক লাভ করেছে। সেসব মুহাজেরের মাঝে হযরত মুহরেয বিন নাযলাও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ওয়াকদী বলেন যে, আমি ইব্রাহীম বিন ইসমাঈলকে বলতে শুনেছি যে, ইয়াওমুস সারহায়হযরত মুহরেয বিন নাযলা ব্যাতিরেকে বনু আব্দুল আশআল এর ঘর থেকে আর কেউ বের হয়নি; এটি যী কারদ এবং গাবা'র যুদ্ধের নাম যা ষষ্ঠ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল। তিনি হযরত মুহাম্মদ বিন মুসলেমা'র ঘোড়ায় আরোহিত ছিলেন, যার নাম ছিল যুল লামা'। মহানবী (সা.) হযরত মুহরেয বিন নাযলা এবং হযরত আম্মারা বিন হাযম এর মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেছিলেন। তিনি বদর, ওহুদ এবং খন্দকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সালেহ্ বিন ওয়াকদি'র মতে সালেহ্ বিন কায়সান থেকে বর্ণিত যে, হযরত মুহরেয বিন নাযলা বলেন, আমি স্বপ্নে নিম্ন আকাশকে দেখি যা আমার জন্য খুলে দেয়া হয়েছে। এপর্যায়ে আমি তাতে প্রবেশ করি আর সপ্তম আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে যাই। এরপর সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত চলে যাই। আমাকে বলা হয় যে, এটি হলো তোমার গন্তব্য। হযরত মুহরেয বলেন, আমি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এর কাছে এই স্বপ্ন বর্ণনা করি, যিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি বলেন, তুমি শাহাদতের শুভসংবাদ গ্রহণ কর। এরপর একদিন তাকে শহীদ করা হয়। তিনি মহানবী (সা.) এর সাথে ইয়ামুস সারাহ্-তে গাবা'র যুদ্ধের জন্য যাত্রা করেন। এই যুদ্ধকে যী কারদও বলা হতো যা ষষ্ঠ হিজরীতে সংঘটিত হয়। আমর বিন উসমান জাহশী নিজ পিতৃপুরুষদের পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত মুহরেয বিন নাযলা যখন বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন তখন তার বয়স ৩১ বা ৩২ বছর ছিল, আর তিনি যখন শহীদ হন তখন তার বয়স প্রায় ৩৭ বা ৩৮ বছর হবে।

(উসদুল গাবা ফি মারেফাতুস সাহাবা, পঞ্চম খণ্ড, পৃ: ৬৮, দারুল কুতুবল ইলমিয়া বেরুত, ২০০৮ সালে প্রকাশিত) (আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৫২, দারু আহইয়ায়ুত তুরাসুল আরবী দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯৬)

হযরত মুহরেয এর শাহাদতের ঘটনা এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ইয়াস বিন সালামা যী কারদ এর যুদ্ধ সম্পর্কে বলেন, আমার পিতা আমাকে বলেছেন , হুদায়বিয়ার সন্ধির ঘটনার পর আমরা মদিনায় ফিরে যাওয়ার জন্য বের হই। অতঃপর আমরা এক স্থানে যাত্রাবিরতি দেই। আমাদের এবং বনু লেহইয়ান এর মাঝে এক পাহাড় ছিল। তারা মুশরিক ছিল। মহানবী (সা.) সেই ব্যক্তির মাগফিরাতের জন্য দোয়া করেন যে রাতে এই পাহাড়ে চড়বে। অর্থাৎ সে যেন মহানবী (সা.) এবং সাহাবীদের জন্য পরিস্থিতির প্রতি দৃষ্টি রাখা এবং নিরাপত্তার মানসে গুপ্তচরের কাজ করে। অর্থাৎ নিগরানী, নিরাপত্তার জন্য যেন ওপরে চড়ে আর দৃষ্টি রাখে কোথাও শত্রুরা হামলা না করে বসে। হযরত সালামা বিন আকওয়া বলেন, আমি সেই রাতে দুই বা তিনবার পাহাড়ে চড়ি। এরপর আমরা মদিনায় পৌঁছি। তিনি বলেন, মহানবী (সা.) রাবাহ্ নামের ব্যক্তির হাতে নিজের উট প্রেরণ করেন, যে মহানবী (সা.) এর দাস ছিল। আর আমি হযরত তালহার ঘোড়া নিয়ে তাতে চড়ে বের হই। আমি সেটিকে উটের সাথে পানি পান করানোর জন্য যাচ্ছিলাম। যখন সকাল হয় তখন আব্দুর রহমান ফাযারি মহানবী (সা.) এর উটের ওপর আক্রমণ করে। এটি পার্শ্ববর্তী একটি শত্রু গোত্র ছিল। তারা সব উট হাকিয়ে নিয়ে যায় এবং সেগুলোর রাখালকে হত্যা করে। বর্ণনাকারী বলেন যে, আমি বললাম- হে রাবাহ্! এই ঘোড়া নাও আর এটিকে তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্'র কাছে পৌঁছে দাও। আর মহানবী (সা.) কে এই সংবাদ দাও যে, মুশরিকরা আপনার পশু লুট করে নিয়ে গেছে। এরপর আমি মদিনার দিকে মুখ করে একটি টিলার ওপর দাঁড়াই আর তিনবার ডাকি- ইয়া সাবাহা, ইয়া সাবাহা। এই বাক্য আরবরা তখন বলতো যখন কোন ছিনতাইকারী ও হত্যাকারী শত্রু সকালে আসতো ,তখন (মানুষ) এশব্দে নারাহ্ উত্তোলন করতো অর্থাৎ উদাত্ত কণ্ঠে ডাকতো আর সাহায্যের জন্য আহ্বান করতো যেন নিজ পক্ষের লোকেরা তৎক্ষণাৎ এসে শত্রুর মোকাবেলা করে আর শত্রুকে তাড়িয়ে দেয়।

কারো কারো মতে, যুদ্ধেলিপ্ত পক্ষগুলোর রীতি ছিল, রাত হতেই তারা যুদ্ধ বন্ধ করে দিত এবং নিজেদের ঠিকানায় ফিরে যেত। আর সাবাহা সম্পর্কে একটি দ্বিতীয় রেওয়ায়েত হলো সাবাহা বলে পরের দিন যোদ্ধাদের অবহিত করা হতো যে, সকাল হয়ে গেছে এখন পুনরায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। লুগাতুল হাদীস গ্রন্থে এই ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। তিনি বলেন, যাহোক এরপর আমি তাদের সন্ধানে এবং তাদেরকে তির মারতে মারতে বের হই, আর আমি রণসঙ্গীত পাঠ করছিলাম এবং বলছিলাম যে,

আনা ইবনুল আকওয়া, ওয়াল ইয়াওমু ইয়াওমুর রুযা

অর্থাৎ আমি আকওয়ার পুত্র আর এই দিনটিহীন ব্যক্তিদের ধ্বংসের দিন। অতএব আমি তাদের মাঝ থেকে যাকেই দেখতাম তার হওদাতে তির মারতাম। এমনকি তিরের ফলা বের হয়ে তার কাঁধ পর্যন্ত পৌঁছে যেত। আমি বলতাম, এই নাও,আনা ইবনুল আকওয়া, ওয়াল ইয়াওমু ইয়াওমুর রুযা। অর্থাৎ আমি আকওয়ার পুত্র আর এই দিনটি হীন ব্যক্তিদের ধ্বংসের দিন। তিনি বলেন, খোদার কসম, আমি তাদের তির মারতে থাকি আর তাদের আহত করতে থাকি। যখন আমার দিকে কোন অশ্বারোহী আসতো তখন আমি কোন গাছের ছায়ায় এসে এর নিচে বসে পড়তাম, অর্থাৎ লুকিয়ে পড়তাম। আর আমি তাকে তির মেরে আহত করে দিতাম। এমনকি যখন পাহাড়ী পথ সরু হয়ে যায় আর তারা সেই সরু পথে প্রবেশ করে তখন আমি পাহাড়ে আরোহন করি আর তাদের দিকে পাথর ছুঁড়তে থাকি। অর্থাৎ যারা মহানবী (সা.) পশুপাল লুট করে নিয়ে যাচ্ছিল তাদের ওপর তিনি একাই আক্রমণ করেন কেননা তিনি একা ছিলেন। প্রথমে তিনি তির মারতে থাকেন এরপর বলেন যে, গিরিপথে পৌঁছে সেখান থেকে আমি পাথর বর্ষণ আরম্ভ করি। এভাবেই আমি তাদের পিছুধাওয়া করতে থাকি, এমনকি আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.) উটগুলোর মাঝ থেকে এমন কোন উট রাখেন নি যেটিকে আমি নিজের পেছনে না ফেলে দিয়েছি। অর্থাৎ গিরিপথের কারণে সেগুলো পেছনে রয়ে যায় আর তারা সামনে চলে যায়, তারা সেগুলোকে আমার এবং তাদের মাঝখানে ছেড়ে চলে যায়। এরপর আমি তির চালানো অব্যাহত রাখি। এমনকি তারা ত্রিশটির অধিক চাদর এবং ত্রিশটি বর্শা ওজন হালকা করার উদ্দেশ্যে ছুড়ে ফেলে দেয়। অর্থাৎ তারা যেহেতু পালাচ্ছিল, উট তো পূর্বেই ছেড়ে দিয়েছিল, এখন নিজেদের জিনিসপত্রও পেছনে ফেলে যেতে থাকে যেন সহজে দৌড়াতে পারে। তিনি বলেন, তারা যে জিনিসই ফেলে যেতো, আমি সেগুলোর ওপর চিহ্ন হিসেবে পাথর রেখে দিতাম যেন মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীরা তা চিনতে পারেন। এমনকি তারা একটি সংকীর্ণ উপত্যকায় পৌঁছে, যেখানে তারা বদর ফাযারি'র কোন পুত্রকে পায়। তারা সেখানে বসে খাদ্য গ্রহণ আরম্ভ করে। আমি একটি চূড়ায় বসেছিলাম। ফাযারি বলে যে, এই ব্যক্তি কে, যাকে আমি দেখতে পাচ্ছি। তারা বলে, এই ব্যক্তি আমাদেরকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। খোদার কসম, সে সকাল থেকে অনবরত আমাদের ওপর তিরন্দাজি করে যাচ্ছে। এমনকি সে আমাদের কাছ থেকে সবকিছু ছিনিয়ে নিয়েছে। সে বলে যে, তোমাদের মাঝ থেকে চার ব্যক্তির তার দিকে যাওয়া উচিত। হযরত সালামা বিন আকওয়া বলেন, তাদের মাঝ থেকে চারজন আমার উদ্দেশ্যে পাহাড়ে চড়ে। যতটা নিকটবর্তী হলে আমি কথা বলতে পারতাম যখন তারা আমার ততটা নিকটবর্তী হয়, আমি তাদের বলি, তোমরা কি আমার সম্পর্কে জান? তারা বলে যে, না, তুমি কে? আমি বললাম যে, আমি সালামা বিন আকওয়া। এরপর তিনি সেই কাফেরদের বলেন যে, তাঁর কসম, যিনি মুহাম্মদ (সা.) এর পবিত্র চেহারাকে সম্মানিত করেছেন, আমি তোমাদের মাঝ থেকে যাকে ইচ্ছা ধরতে পারি। কিন্তু তোমাদের মাঝ থেকে কেউ যদি আমাকে পাকড়াও করতে চায় তাহলে তা পারবে না। যে চারজন এসেছিল তাদের একজন কিছুটা ভয় পেয়ে যায় এবং বলে যে, আমারও একই ধারণা। এরপর তারা চারজনই ফিরে যায়। আমি আমার নিজের স্থানে বসে থাকি। এমনকি আমি মহানবী (সা.) এর ঘোড়াগুলোকে গাছপালার মাঝদিয়ে আসতে দেখি। তাদের মাঝে সর্বপ্রথম ছিলেন আখরাম আসাদী আর তার পিছনে ছিলেন আবু কাতাদা আনসারী। আর তার পিছনে ছিলেন মিকদাদ বিন আসওয়াদ কিন্দি। আমি আখরাম অর্থাৎ হযরত মুহরেয এর ঘোড়ার লাগাম ধরি। তখন তারা পিঠ ফিরিয়ে চতুর্দিকে পালিয়ে যায়। এখানে কিছুটা অস্পষ্টতা রয়েছে। আমার মনে হয়, সেখানে বসে অন্য যারা খাবার খাচ্ছিল, যখন তারা দেখে যে, তিনি আরো নিকটবর্তী হয়ে গেছেন তখন তারাও পিছু হটে। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আখরাম, অর্থাৎ মুহরেযকে বলেন যে,যতক্ষণ মহানবী (সা.) ও তাঁর সাহাবীগণ পৌঁছে না যান, তুমি আত্মরক্ষা কর যেন তারা তোমাকে ধ্বংস না করে দেয়। তিনি বলেন, হে সালমা! যদি তুমি আল্লাহ্ তা'লা এবং শেষ দিবসে ঈমান রাখ আর তুমি জান যে, জান্নাত সত্য এবং অগ্নি অর্থাৎ জাহান্নাম সত্য, তাহলে তুমি আমার এবং শাহাদতের মাঝে প্রতিবন্ধক হইও না। আমি তাকে ছেড়ে দিই। এমনকি তিনি অর্থাৎ আখরাম এবং আব্দুর রহমান পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং তিনি আব্দুর রহমানসহ তার ঘোড়াকে আহত করেন। আব্দুর রহমান তাকে অর্থাৎ আখরাম বা হযরত মুহরেযকে বর্শা মেরে শহীদ করে দেয় এবং তার ঘোড়ায় আরোহন করে নিজ লোকদের মাঝে ফিরে যেতে উদ্যত হয়। তখন মহানবী (সা.) এর সাথে যারা আসছিল তাদের মাঝ থেকে একজন অর্থাৎ মহানবীর দক্ষ অশ্বারোহী আবু কাতাদা আব্দুর রহমানের পিছু ধাওয়া করেন, এবং তাকে ধরে ফেলেন আর বর্শা মেরে তাকে হত্যা

করেন। এব্যক্তি হযরত মুহরেযকে শহীদ করেছিল। তিনি বলেন, তাঁর কসম যিনি মুহাম্মদ (সা.) এর পবিত্র চেহারাকে সম্মানিত করেছেন। আমি দৌঁড়ানো অবস্থায় তাদের পিছু ধাওয়া করতে থাকি আর তাদের পিছুধাওয়া অব্যাহত রাখি। এমনকি আমি মুহাম্মদ (সা.) এর সাহাবীদের মাঝ থেকে কাউকে বরং তাদের ধূলাকেও নিজের পিছনে দেখতে পাই। অর্থাৎ তিনি অনেক দূর চলে যান। এমনকি সূর্যাস্তের পূর্বে তারা একটি উপত্যকায় পৌঁছে যেখানে একটি ঝর্ণা ছিল। সেটিকে যী কারদ বলা হতো।অর্থাৎ সেসব লোক, যারা মাল লুটপাট করে নিয়ে যাচ্ছিল, তারা সেখান থেকে পানি পান করতে চাচ্ছিল এবং পিপাসার্ত ছিল । এরপর তারা আমাকে তাদের পেছনে দৌঁড়াতে দেখতে পায়। আমি তাদেরকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেই এবং তারা সেখান থেকে এক ফোঁটা পানিও পান করতে পারে নি। তারা সেখান থেকে বের হয়ে অপর একটি উপত্যকার দিকে দ্রুত অগ্রসর হয়। আমিও দৌঁড় দেই। আমি তাদের মাঝ থেকে যাকেই পিছনে পেতাম, অর্থাৎ লুকিয়ে লুকিয়ে পেছনে দৌঁড়াতে থাকি।আর যে-ই পেছনে রয়ে যেত তার কাঁধের হাড়ে তির মারতাম। আমি বলতাম, এই নাও, আনা ইবনুল আকওয়া, ওয়াল ইয়াওমু ইয়াওমুর রুযা । অর্থাৎ আমি আকওয়ার পুত্র আর এ দিনটি নীচ বা হীন ব্যক্তিদের ধ্বংসের দিন। তিনি বলেন, সে বলে যে, আকওয়া লাঞ্ছিত হোক, সকালের আকওয়ার কথা বলছো? অর্থাৎ তিনি যাদেরকে আহত করছিলেন তাদের মাঝ থেকে একজন বলে যে, সেই সকালের আকওয়া যে সকাল থেকে আমাদের পিছু ধাওয়া করছে। আমি বললাম যে, হ্যাঁ, হে নিজ প্রাণের শত্রু! তোমার সেই সকালের আকওয়া। তারা দুটি ঘোড়া উপত্যকায় নিজেদের পেছনে ছেড়ে যায়। আমি সেগুলোকে হাকিয়ে মহানবী (সা.) এর কাছে যাওয়ার জন্য যাত্রা করি। আমি আমেরকে একটি পানির মশকে কিছুটা পানি মিশ্রিত দুধ এবং একটি মশকে পানি নিয়ে আসতে দেখি। আমি ওযু করি এবং পান করি। অতঃপর আমি মহানবী (সা.) এর কাছে আসি, আর তিনি (সা.) তখন সেই ঝর্ণার কাছে ছিলেন যেখান থেকে আমি সকালে তাদের অর্থাৎ সেই ছিনতাইকারীদের তাড়িয়ে দিয়েছিলাম। মহানবী (সা.) সেই পানির কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন। আমি দেখলাম যে, মহানবী (সা.) সেই উট এবং সমস্ত জিনিস যা আমি মুশরেকদের কাছ থেকে ছাড়িয়ে এনেছিলাম, হস্তগত করেছেন। হযরত বেলাল আমি যেসব উট তাদের হাত থেকে মুক্ত করেছিলাম সেই উটগুলোর মাঝ থেকে একটি উটনী জবাই করেন। তিনি মহানবী (সা.) এর জন্য কলিজা এবং কুঁজের মাংস নিয়ে ভুনা করছিলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমাকে সৈন্যবাহিনী থেকে অর্থাৎ যারা আপনার সাথে এসেছে তাদের মধ্য থেকে ১০০জন লোককে নির্বাচন করার অনুমতি দিন। তাহলে আমি তাদের পিছু ধাওয়া করে তাদের সবাইকে হত্যা করব যেন তাদের গোত্রকে অবহিত করার মতো কোন লোকওজীবিত না থাকে। অর্থাৎ যারা এই মালামাল লুটপাট বা ছিনতাই করে নিয়ে যাচ্ছিল তাদের কথা হচ্ছে। রসূলুল্লাহ্ (সা.) খিলখিলিয়ে হাসেন। এমনকি আগুনের আলোয় তাঁর (সা.) দাঁত মোবারক দেখা যেতে থাকে। তিনি বলেন, হে সালামা! তুমি কি মনে কর যে, তুমি এটি করতে পারবে আর তাদের সবাইকে তাদের ঘরে পৌঁছার পূর্বেই হত্যা করতে পারবে? আমি বললাম যে, হ্যাঁ, তাঁর কসম , যিনি আপনাকে সম্মানিত করেছেন। তিনি (সা.) বলেন, এখন তারা গাতফান এর সীমানায় পৌঁছে গিয়েছে।

অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, এখানে এই শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যে, হযরত সালামা বিন আকওয়া মহানবী (সা.) এর কাছে মুশরিকদের দ্বিতীয়বার পিছু ধাওয়া করার অনুমতি চাইলে মহানবী (সা.) বলেন, ইয়া ইবনাল আকওয়া, মালাকতা ফাসজে'। অর্থাৎ হে আকওয়ার পুত্র! তুমি যখন বিজয় লাভ করেছ, যেতে দাও এবং উপেক্ষা কর। এখন তাদের পিছু ধাওয়া করে এবং হত্যা করে কী লাভ। অতএব এই হলো উন্নত আদর্শ। প্রথমে তিনি একা যুদ্ধ করতে থাকেন, হযরত মুহরেয আসলে তার ওপর তারা গুপ্ত-হামলা করে এবং তাকে শহীদ করে। প্রথমে কোনভাবে তিনি তাদের ঘোড়াকে ধরে ফেলেন আর হামলা প্রতিহত করেন এবং বেঁচে যান। কিন্তু পুনরায় আক্রমণ হয় আর তিনি শহীদ হন। এটি হলো তার অর্থাৎ হযরত মুহরেয-এর শাহাদতের ঘটনা। আর দ্বিতীয় বিষয় ছিল তার বীরত্ব। এছাড়া রণকৌশল সম্পর্কেও তিনি অভিজ্ঞ ছিলেন। অতি দক্ষতার সাথে ছিনতাইকারীদের কাছ থেকে সমস্ত মাল পুনরুদ্ধার করেন। এখানে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো ধনসম্পদ পুনরুদ্ধার করার পরও যখন তিনি বলেন যে, আমি পিছুধাওয়া করে তাদের সবাইকে হত্যা করব; তখন মহানবী (সা.) বলেন যে, তাদেরকে যেতে দাও। সম্পদ যেহেতু ফেরত পাওয়া গেছে তাই ছেড়ে দাও। অতএব এ হলো মহানবী (সা.) এর উন্নত আদর্শ, কেননা হত্যা বা খুন করা তাঁর (সা.) উদ্দেশ্য ছিল না। ছিনতাইকারী এবং আক্রমণকারীদের কাছ থেকে যখন তিনি সম্পদ পুনরুদ্ধার করেন আর তাদের সবাই নিজেদের সবকিছু ছেড়ে পালিয়ে যায়, তখনতাদের কেউ কেউ আহতও হয়, কিন্তু তিনি সেখানে কোন প্রকার যুদ্ধ, খুন বা হত্যা করেন নি।

যাহোক তিনি বলেন, মহানবী (সা.) যখন তাকে এসব কথা বলছিলেন যে, ছেড়ে দাও, যেতে দাও, তারা পালিয়ে গেছে, তখন বনি গাতফান এর এক ব্যক্তি আসে এবং বলে যে, অমুক ব্যক্তি তাদের জন্য উট জবাই করেছে। যখন সে উটের চামড়া ছাড়াচ্ছিল তখন সে ধূলা দেখতে পায় এবং বলে যে, তারা এসে গেছে। এরপর তারা সেখান থেকেও পালিয়ে যায়। প্রভাতে মহানবী (সা.) বলেন, আজ আমাদের সর্বোত্তম অশ্বারোহী হলেন আবু কাতাদা, আর পদাতিক সৈনিকদের মাঝে সর্বোত্তম হলেন সালামা। অর্থাৎ পদাতিক যোদ্ধাদের মাঝে সর্বোত্তম হলেন সালামা, যিনি তাদেরকে কঠিন পরিস্থিতির মাঝে ফেলে দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, মহানবী (সা.) আমাকে দুটি অংশ দান করেছেন। একটি আরোহীর অপরটিপদাতিকের। এরপর মদিনা ফেরার পথে মহানবী (সা.) আমাকে আসবা উটনীর ওপর নিজের পেছনে বসান। তিনি বলেন, আমরা যখন যাচ্ছিলাম তখন আনসারের এক ব্যক্তি, যার চেয়ে দ্রুত কেউ দৌঁড়াতে পারতনা, তিনি বলতে আরম্ভ করেন যে, মদিনা পর্যন্ত দৌঁড় প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার কেউ আছে কি? যুদ্ধ এবং শত্রুদের নির্যাতন সত্ত্বেও সাহাবীরা নিজেদের বিনোদনের ব্যবস্থাও করে নিতেন। একে অপরকে হালকা চ্যালেঞ্জও করতেন যেন সময়ও কেটে যায় আর শত্রুদের পক্ষ থেকে যে, স্থায়ী মানসিক চাপ থাকে তা-ও কিছুটা প্রশমিত হয়। যাহোক তিনি বলেন যে, কেউ আছে কি যে আমার সাথে দৌঁড়বে? এমন কোন দৌঁড়বিদ আছে কি? তিনি বলেন, তিনি বারবার এই কথার পুনরাবৃত্তি করেন। আমি যখন এ কথা শুনি তখন আমি সেই দ্বিতীয় সাহাবীকে রসিকতা করে বলি যে, তুমি কি কোন সম্মানিত ব্যক্তির সম্মান কর না, কোন বুযুর্গকে ভয় কর না? সে বলে যে, মহানবী (সা.) ব্যতিরেকে আর কাউকে নয়। অর্থাৎ মহানবী (সা.) ছাড়া আর কাউকে আমি ভয় করি না। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার পিতামাতা আপনার জন্য নিবেদিত, আমাকে এই ব্যক্তির সাথে দৌঁড় প্রতিযোগিতা করতে দিন। তিনি (সা.) বলেন, ঠিক আছে, যদি তুমি চাও তাহলে কর। আমি সেই ব্যক্তিকে বলি, চল প্রতিযোগিতা করি। তিনি বলেন, এরপর আমি আমার পা ঘুরিয়ে লাফ দিই এবং দৌঁড় আরম্ভ করি। আমি এক বা দুই উপত্যকা তার পিছনে দৌঁড়াই। আমি নিজের শক্তি সঞ্চিত রাখছিলাম। এরপর আমি ধীরে ধীরে তার পিছনে দৌঁড়াতে থাকি। অতঃপর আমি গতি কিছুটা বাড়িয়ে দেই এবং তার কাছে পৌঁছে যাই। এভাবে দৌঁড় চলতে থাকে। সে দৌঁড়ের ক্ষেত্রে মদিনায় সবার চেয়ে দ্রুত মানুষ ছিল। তিনি বলেন, আমি গতি আরো কিছুটা বাড়িয়ে দিয়ে তাকে ধরে ফেলি এবং তার কাঁধের মাঝামাঝি ঘুষি দিই। আমি বলি, আল্লাহ্‌র কসম, তুমি পেছনে রয়ে গেলে।

এক বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয় তিনি বলেছেন, আমি মদিনা পর্যন্ত তার সামনে ছিলাম। এরপর আমরা তিন রাত এখানে অবস্থান করি। অতঃপর মহানবী (সা.) এর সাথে খায়বারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। (সহী মুসলিম, ৯ম খন্ড, পৃ: ২২৮-২৩৮, কিতাবুল জিহাদ) (সহী বুখারী কিতাবুল মাগাযী) অর্থাৎ সেখানে অবস্থানের পর খায়বারের উদ্দেশ্যে বের হন।

তাবরী'র ইতিহাসে এই যুদ্ধ সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিত এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আসেম বিন আমর বিন কাতাদা থেকে বর্ণিত যে, যী কারদ এর যুদ্ধে শত্রুদের কাছে সবার আগে হযরত মুহরেয বিন নাযলার ঘোড়া পৌঁছে, যিনি বনু আসাদ বিন হুযায়মা গোত্রের সদস্য ছিলেন। হযরত মুহরেয বিন নাযলাকে আখরামও বলা হতো। অনুরূপভাবে তাকে কুমায়েরও বলা হতো। যখন শত্রুদের পক্ষ থেকে লুটপাট এবং বিপদের আশঙ্কায় সাহাবীদের একত্রিত হওয়ার ঘোষণা আসে তখন হযরত মাহমুদ বিন মাসলামা'র ঘোড়া, যা তার বাগানে বাঁধা ছিল, অন্যান্য ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি অর্থাৎ ডাক শুনতে পায় এবং নিজের জায়গায় লাফালাফি আরম্ভ করে। এটি একটি উৎকৃষ্ট এবং প্রশিক্ষিত ঘোড়া ছিল। তখন বনু আব্দুল আশআল এর মহিলাদের মাঝ থেকে কতিপয় মহিলা এই বাঁধা ঘোড়াকে এভাবে লাফাতে দেখে হযরত মুহরেয বিন নাযলাকে বলে যে, হে কুমায়ের! আপনার কি নিজের এই ঘোড়ায় আরোহনের সামর্থ্য আছে? আর এই ঘোড়া কেমন তা আপনি দেখতেই পাচ্ছেন। এরপর তিনি গিয়ে মুসলমান এবং মহানবী (সা.) এর সাথেমিলিত হন। তিনি বলেন, হ্যাঁ আমি প্রস্তুত আছি। এরপর মহিলারা সেই ঘোড়াটি তার হাতে সোপর্দ করে। তিনি অর্থাৎ হযরত মুহরেয তাতে আরোহন করে যাত্রা করেন। তিনি এই ঘোড়ার লাগাম ঢিল ছেড়ে দেন। এমনকি তিনি সেই দলের সাথে মিলিত হন যা মহানবী (সা.) এর সাথে যাচ্ছিল এবং তিনি তাদের সামনে দাঁড়িয়ে যান। এরপর হযরত মুহরেয বিন নাযলা বলেন, হে ছোট্ট দল! থাম, যতক্ষণ না অন্যান্য মুহাজের এবং আনসার তোমাদের সাথে মিলিত হয়, যারা তোমাদের পিছনে

রয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, শত্রুদের এক ব্যক্তি তার ওপর আক্রমণ করে এবং তাকে শহীদ করে। এরপর সেই ঘোড়া অনিয়ন্ত্রিত হয়ে ছুটতে থাকে এবং কেউ সেটিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে নি। এমনকি সেটি বনু আব্দুল আশআল এর মহল্লায় এসে সেই রশির কাছেই দাঁড়িয়ে যায় যা দিয়ে সেটিকে বেঁধে রাখা হয়েছিল। অতএব সেদিন তিনি ছাড়া মুসলমানদের আর কেউ শহীদ হয় নি। সহীহ্ মুসলিমের বর্ণনা অনুযায়ী সেই সাহাবীর নাম ছিল হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা। তার ঘোড়ার নাম ছিল যুল লামা'। অপর এক বর্ণনা অনুযায়ী হযরত মুহরেয বিন নাযলা শাহাদতের সময় হযরত উকাশা বিন মিহসান এর ঘোড়ায় আরোহিত ছিলেন, সেই ঘোড়াকে জানাহ্ বলা হতো, এবংশত্রুদের কাছ থেকে কিছু পশু ছাড়িয়ে এনেছিলেন। মহানবী (সা.) নিজের স্থান থেকে যাত্রা করেন এবং যী কার্দ এর পাহাড় পর্যন্ত পৌঁছে বিরতি দেন। সেখানেই অন্য সাহাবীরা মহানবী (সা.) এর কাছে এসে উপস্থিত হন। মহানবী (সা.) এক দিন এবং এক রাত সেখানে অবস্থান করেন। সালামা বিন আকওয়া তাঁর (সা.) কাছে নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি যদি একশত ব্যক্তিকে আমার সাথে প্রেরণ করেন তাহলে আমি বাকি পশুগুলোও শত্রুদের কাছ থেকে ছাড়িয়ে আনছি এবং তাদের ঘাঁড় চেপে ধরছি। মহানবী (সা.) বলেন, কোথায় যাবে? এখন তো তারা গাতফান এর মদ পান করছে। মহানবী (সা.) নিজ সাহাবীদেরকে প্রতি দলে এক এক শ' করে বিভিন্ন দলে ভাগ করে তাদের মাঝে খাবারের জন্য উট বণ্টন করেন, যেগুলোকে সাহাবীরা খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে।এরপর মহানবী (সা.) মদিনায় ফিরে আসেন।

(তারিখুত তিবরানী, তৃতীয় ভাগ) (আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৭০, দারু আহইয়ায়ুত তুরাসুল আরবী দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯৬)

এবং তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নি। তাদেরকে ছেড়ে দেন বা যেতে দেন। হযরত মুহরেযই কেবল সেখানে শহীদ হন। এক বর্ণনা অনুযায়ী তিনি অশ্বারোহীদের মাঝে সর্বপ্রথম শহীদ ছিলেন। আর প্রথম বর্ণনায়ও এ কথা-ই বলা হয়েছে।

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হচ্ছে তার নাম হলো, হযরত সোআয়বাত বিন সা'দ (রা.)। তাকে সোআয়বাত বিন হারমালাও বলা হয়। তার নাম সোআয়বাত বিন হারমালা এবং সালীব বিন হারমালাও বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত সোআয়বাত বনু আবদে দার গোত্রের সদস্য ছিলেন। তাঁর মায়ের নাম ছিল হুনায়দা। তিনি প্রথমদিকে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অধিকাংশ জীবনী লেখকগণ তাকে ইথিওপিয়ায় হিজরতকারীদের মধ্যে গণ্য করেছেন।

(উসদুল গাবা ফি মারেফাতুস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৫৪, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া বেরুত, ২০০৮ সালে প্রকাশিত) (আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৬ষ্ঠ ভাগ, পৃ: ৩৬৮, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া বেরুত, ২০০৫)

হযরত সোআয়বাত মদিনায় হিজরত করেন আর হিজরতের পর তিনি আব্দুল্লাহ্ বিন সালামা আজলানীর গৃহে অবস্থান করেন। মহানবী (সা.) হযরত সোআয়বাত এবং হযরত আয়েস বিন মায়েস এর মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করেছেন। হযরত সোআয়বাত বদর এবং ওহুদের যুদ্ধেও যোগদান করেছিলেন।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৬৫, দারু আহইয়ায়ুত তুরাসুল আরবী দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯৬)

হযরত উম্মে সালমা বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের এক বছর পূর্বে হযরত আবু বকর (রা.) সিরিয়ার একটি অঞ্চল 'বুসরা'য় বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন। তার সাথে নয়েমান এবং সোআয়বাত বিন হারমালাও সফর করেন আর তাদের উভয়েই বদরের যুদ্ধেও যোগদান করেছিলেন। নায়েমান পাথেয় বা রসদের দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। সোআয়বাত রসিক প্রকৃতির ছিলেন। তিনি নয়েমানকে বলেন, আমাকে খাবার খাওয়াও, রশদ বা খাদ্য সামগ্রী ছিল নয়েমানের তত্ত্বধানে, কাফেলার পুরো খাবার-দাবার আয়োজনের দায়িত্ব ছিল তার ওপর। তিনি (অর্থাৎ সোআয়বাত) তাকে বলেন, খাবার খাওয়াও। তিনি বলেন, আবু বকর (রা.) যতক্ষণ না আসবেন, আমি খাবার দেবো না। তিনি বলেন, তুমি আমাকে খাবার না দিলে আমি তোমাকে ক্ষেপাব। আমি পূর্বেও সংক্ষেপে এই ঘটনা বর্ণনা করেছিলাম। যাত্রাকালে তারা যখন একটি গোত্রের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন হযরত সোআয়বাত তাদেরকে বলেন, তোমরা কি আমার কাছ থেকে আমার এক কৃতদাসকে ক্রয় করবে? তারা উত্তরে বলে, হ্যাঁ। সোআয়বাত সেই গোত্রের লোকদের বলেন যে, স্মরণ রেখ! এই কৃতদাস বেশি কথা বলে, আর সে একথাই বলতে থাকবে যে, আমি স্বাধীন। সে তোমাদেরকে এই কথা বললে তাকে ছেড়ে দিয়ে আমার ব্যবসা খারাপ করো না। তারা উত্তর দেয় যে, না, বরং আমরা তাকে তোমার কাছ থেকে কিনতে চাই। তখন তারা দশ উটের বিনিময়ে সেই কৃতদাসকে কিনে নেয়। এরপর তারা হযরত নয়েমান এর কাছে আসে এবং তার গলায় রশি পরায়। নয়েমান বলেন, এই ব্যক্তি তোমাদের সাথে ঠাট্টা করছে। আমি স্বাধীন, কৃতদাস নই। কিন্তু তারা উত্তর দেয় যে, সে তোমার সম্পর্কে পূর্বেই আমাদের বলে দিয়েছিল যে, তুমি আমাদেরকে একথাই বলবে, এরপর তারা (তাকে) ধরে নিয়ে যায়। হযরত আবু বকর (রা.) যখন ফিরে আসেন আর লোকেরা তার সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেন তখন তিনি ঐ লোকদের পেছনে পেছনে যান আর তাদেরকে তাদের উটগুলো ফেরত দিয়ে নয়েমানকে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন, (আর বলেন,) ইনি (অর্থাৎ নয়েমান) কৃতদাস নন বরং স্বাধীন, উনি (অর্থাৎ সোআয়বাত) ঠাট্টা করেছিল। সাহাবীদের মধ্যে এ ধরনের হাসি-ঠাট্টার রীতিও ছিল। যাহোক, যখন এরা ফিরে এসে মহানবী (সা.)-এর সমীপে হাজির হয় এবং তাঁকে এ ঘটনা বলেন, বর্ণনাকারী বলেন যে, তখন মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীরা এক বছর পর্যন্ত এ ঘটনা উপভোগ করেন।

(সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুল আদাব) (আল মুজামুল বুলদান, ১ম খণ্ড, পৃ: ৫২২, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া বেরুত)

মহানবী (সা.)'ও এ ঘটনায় খুব হাসেন আর এক বছর ধরে কৌতুকটি জনপ্রিয় ছিল। যাহোক, একটি ব্যতিক্রমসহ উপরোক্ত ঘটনা এভাবেও দেখা যায়, বিভিন্ন গ্রন্থে লেখা আছে যে, হযরত সোআয়বাত নন বরং হযরত নয়েমান বিক্রেতা ছিলেন।

সাহাবীদের স্মৃতিচারণের পর আমি যে কথা সংক্ষেপে বলতে চাই তা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি এলহাম "ওয়াস্‌সে মাকানাকা" (অর্থাৎ তুমি তোমার গৃহ সম্প্রসারিত কর) সম্পর্কিত। এই এলহাম বিভিন্ন সময়ে তাঁর (আ.)প্রতি হয়েছে। তিনি (আ.) বলেন, শুরুতে যখন আল্লাহ্ তা'লা "ওয়াস্‌সে মাকানাকা"র এলহাম করেন তখন হয়ত কেবল দুইতিনজন মানুষই আমার বৈঠকে আসতো, এছাড়া আর কেউ আমাকে জানতো না।

(সীরাজে মুনীর, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১২, পৃ: ৭৩)

এরপর বিভিন্ন সময়ে অন্যান্য এলহামের সাথেও "ওয়াস্‌সে মাকানাকা"র এলহামটি হয়েছে। অর্থাৎ নিজের গৃহ বা আবাসনের সম্প্রসারণ কর। এর সাথে অন্যান্য যে এলহাম হয়েছে তাতে বিভিন্ন সুসংবাদ এবং বিভিন্নভাবে আল্লাহ্‌র কৃপারাজি বর্ষিত হওয়ারও উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা যখন নিজ নবীদের এলহামের মাধ্যমে কোন নির্দেশ প্রদান করেন যে, এটি কর, তখন এর অর্থ হয় আল্লাহ্ তা'লা এর জন্য সাহায্য ও সহযোগিতাও করবেন আর উপকরণেরও ব্যবস্থা করবেন, এভাবে একাজ সম্পন্ন হবে- এটিই আমাদের অভিজ্ঞতা। জামা'তের ইতিহাস আমাদের বলে যে, কত মহিমার সাথে আল্লাহ্ তা'লা এই এলহাম পূর্ণ করেছেন আর এখনও পূর্ণ করে চলেছেন। আমরা যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তুচ্ছ দাস, আমাদেরকেও বিভিন্ন সময়ে এই এলহাম পূর্ণ হওয়ার দৃশ্য দেখিয়ে চলেছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতিটি এলহাম এবং কোন বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লার তাঁকে নির্দেশ প্রদান অথবা ভবিষ্যদ্বাণীর আদলে অবহিত করা মূলত তাঁর মাধ্যমে মহানবী (সা.)-এর ধর্ম অর্থাৎ ইসলামের প্রচার এবং উন্নতির সুসংবাদ আর তাঁর তিরোধানের পর খিলাফত ব্যবস্থার মাধ্যমে মহানবী (সা.)-এর বাণীকে বিশ্বময় বিস্তারের সুসংবাদ বটে। অতএব অগ্রপানে আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ অথবা যে উন্নতি আমরা দেখি তা মূলত আল্লাহ্ তা'লার এই পরিকল্পনারই অংশ যা আল্লাহ্‌তা'লা জগৎময় ইসলামের প্রচারের জন্য হাতে নিয়েছেন।

এই ভূমিকার পর আমি পুনরায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এলহাম "ওয়াস্‌সে মাকানাকা" (অর্থাৎ তুমি তোমার গৃহকে সম্প্রসারিত কর)এর দিকে আসছি। এখানে অর্থাৎ যুক্তরাজ্যে খিলাফতের হিজরতের পর, যুক্তরাজ্যে, ইউরোপে, আমেরিকায়, আফ্রিকায় এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশে জামা'তের প্রসারের পাশাপাশি জামাতের কেন্দ্র ও স্থাপনা বৃদ্ধি পেতে থাকে। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদেরকে জায়গা প্রদান করতে থাকেন। হযরত খলীফাতুল

মহানবী (সা.)-এর বাণী

"যে কাজ 'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম' ছাড়া আরম্ভ করা হয়, সেটি অসম্পূর্ণ ও কল্যাণশূন্য থেকে যায়।"

(আল জামিয়ুস সাগীর লিল সুয়ুতি হারফে কাফ)

দোয়াপ্রার্থী: গোলাম মুস্তফা, জেলা আমীর জামাত আহমদীয়া, মুর্শিদাবাদ

মসীহ্ রাবে যখন এখানে হিজরত করেন তখন তাৎক্ষণিকভাবে আল্লাহ্ তা'লা অসাধারণভাবে স্বীয় সাহায্যের নিদর্শন দেখান আর জামা'ত ইসলামাবাদে ২৫ একর জমি ক্রয় করার তৌফিক লাভ করে। এরপর এতে আরো ৬ একর যুক্ত হয়, যেখানে (দীর্ঘদিন) জলসাও হতো আর জামা'তের কর্মচারী এবং ওয়াকেফীনদের জন্য কিছু বাসস্থানেরও সুবিধা ছিল। খলীফাতুল মসীহ্র থাকার জন্য একটি বাংলোও ছিল, কয়েকটি অফিসও ছিল। একটি ব্যারাকরূপী জায়গা ছিল যেখানে মসজিদ বানানো হয়েছিল। আমার স্মরণ আছে একবার ১৯৮৫ সনে যখন আমি এখানে এসেছিলাম তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) আমাকে বিশেষভাবে বলেছিলেন যে, "কেন্দ্রের জন্য আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে খুবই চমৎকার একটি জায়গা দান করেছেন"। হুবহু এই বাক্য না হলেও মোটামুটি শব্দ এগুলোই ছিল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এবং বিভন্ন স্বাক্ষ্যপ্রমাণও এর সত্যায়ন করে যে, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)'র এখানে যথারীতি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার সংকল্প ছিল। যাহোক, প্রতিটি কাজের জন্যই আল্লাহ্ তা'লা একটি সময় নির্ধারণ করে রেখেছেন। এখন আল্লাহ্ তা'লা ইসলামাবাদে নতুন নির্মাণ কাজের তৌফিক দিয়েছেন। উত্তম সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত কয়েকটি অফিস বানানো হয়েছে। গতানুগতিক মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। যুগ খলীফার জন্য বাসস্থান নির্মাণ করা হয়েছে। ওয়াকেফে যিন্দেগী ও কর্মচারীদের জন্যও কিছু গৃহ নির্মিত হয়েছে, আরও কিছু নির্মিত হবে।

লণ্ডনে আবাসগৃহ অফিসে রূপান্তরিত করে সাময়িকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছিল আর খুবই ছোট্ট কক্ষে কষ্টে-সৃষ্টে কাজ হচ্ছিল। কাজের বিস্তৃতির কারণে জায়গা খুবই ছোট হয়ে যায়। এছাড়া কাউন্সিলও আপত্তি করতে যে, এসব গৃহ আবাসনের জন্য বানানো হয়েছে অথচ তোমরা অফিস বানিয়ে রেখেছ, এখান থেকে অফিস তুলে দাও। বিভিন্ন সময়ে সচরাচর এ ধরনের আওয়াজ উত্থিত হতো। এখন এই নির্মাণের ফলে এখানে (অর্থাৎ, লণ্ডনে/ মসজিদ ফযলের পাশে) বিভিন্ন বাড়িতে যে তিন-চারটি অফিস ছিল তা ইনশাআল্লাহ্ তা'লা ইসলামাবাদে স্থানান্তরিত হবে। অনুরূপভাবে ইসলাবাদের পাশেই ফার্নহামে একটি বেশ বড় দ্বিতল বিল্ডিংও আল্লাহ্ তা'লা জামা'তকে দান করেছেন যা ইসলামাবাদ থেকে ২/৩ মাইল দূরত্বে অবিস্থত, সেখানে (রাকীম) প্রেস কাজ করছে, এছাড়া কয়েকটি অফিসও রয়েছে। এছাড়া এখানে খোদ্দামুল আহমদীয়াও বড় একটি বিল্ডিং ক্রয় করার সৌভাগ্য লাভ করেছে। সেই সাথে ইতিপূর্বে জলসাগাহের জন্য (ইসলামাবাদের) অদূরে দুশতাধিক একর বিশিষ্ট হাদীকাতুল মাহদী ক্রয় করারও আল্লাহ্ তা'লা তৌফিক দিয়েছেন। এরপর লন্ডনে যে জামেয়া ছিল তা-ও এখান থেকে স্থানান্তরিত হয়েছে আর জামেয়ার বর্তমান জায়গা অকল্পনীয় কম মূল্যে আর উত্তম পরিবেশে এবং উন্নত সুযোগ-সুবিধাসজ্জিত অবস্থায় আল্লাহ্ তা'লা দান করেছেন। এভূমির মোট আয়তন হলো প্রায় ৩০একর। এই সমস্ত জায়গা ইসলামাবাদ থেকে ১০ থেকে ২০ মিনিটের দূরত্বে অবস্থিত। ইসলামাবাদের বর্তমান প্রকল্পের সাথে এসব জায়গা ক্রয় করার কোন পূর্ব পরিকল্পনা ছিল না। এসবই আল্লাহ্ তা'লার পরিকল্পনা বা অভিপ্রায় ছিল। এই সকল জায়গা, এক এলাকায় কাছাকাছি, একত্র হতে থাকে আর আল্লাহ্ তা'লা কেন্দ্রের পাশাপাশি অন্যান্য জায়গাগুলোরও ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। জামেয়াও (কেন্দ্রের) নিকটে থাকা আবশ্যক। দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা এসব জায়গা, এসব স্থাপনার এক এলাকায় একত্রিত হওয়া সকল অর্থে কল্যাণময় করুন।

আমি যেমনটি বলেছি, যুগ খলীফার বাসস্থান এবং অফিসও সেখানে নির্মিত হয়েছে। বড় মসজিদও নির্মিত হয়েছে। তাই আমিও লণ্ডন থেকে কয়েকদিনের মধ্যে ইসলামাবাদে স্থানান্তরিত হবো, ইনশআল্লাহ্। দোয়া করুন স্থানান্তরের পর সেখানে অবস্থানও যেন সবদিক থেকে কল্যাণময় হয়। আল্লাহ্ সর্বদা কৃপা করুন। আল্লাহ্ তা'লা ইসলামাবাদ থেকে ইসলামের প্রচারের কাজকে পূর্বের তুলনায় আরো ব্যপকতা দান করুন। "ওয়াসসে মাকানাকা" কেবল গৃহায়নের ক্ষেত্রে বিস্তৃতির কারণ যেন না হয় বরং আল্লাহ্ তা'লার বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও যেন প্রসারতার মাধ্যম হয়। এখানে একথাও সুস্পষ্ট করে দিচ্ছি যে, মসজিদ ফযলের প্রতিবেশীদের মসজিদে আগমনকারী আহমদীদের কারণে এবং ট্রাফিক ও পার্কিং এর কারণে কষ্টও অভিযোগ ছিল। এজন্য নতুন জায়গায় (অর্থাৎ ইসলামাবাদে) প্রতিবেশীদের এবং এলাকার লোকদের নামাযের জন্য বা এমনিতেও যারা ইসলামাবাদে আসবেন তারা তাদেরকে কোন প্রকার অভিযোগের সুযোগ দিবেন না। (ইসলামাবাদের) আশেপাশের লোকেরা আসবেন,ট্রাফিক আইন মেনে চলা আর সাবধানতার বিষয়টি সর্বদা দৃষ্টিগোচর রাখুন।

জুমুআর নামাযের যতটুকু সম্পর্ক আছে আমি সচরাচর এখানে অর্থাৎ বায়তুল ফুতুহ্'তে এসে জুমুআর নামায পড়াবো। আমীর সাহেবকে আমি বলেছি, তিনি রীতিমত পরিকল্পনা করে জামাতসমূহকে জানিয়েও দিবেন যে, কারা বা কোন কোন জামা'ত ইসলামাবাদে জুমুআ পড়বেন বা সেখানে কারা জুমুআ পড়বে! সেখানকার পার্শ্ববর্তী জামা'তগুলোই হবে, তাদের মধ্য হতে যারাই পড়তে চাইবেন তারা সেখানে গিয়ে (নামায) পড়তে পারবে। কোন্ কোন্ এলাকার লোক হবে আর এর বণ্টন কেমন হবে (তা আমীর সাহেব জানিয়ে দিবেন)। ইসলামাবাদের ২০ মাইলের ভিতর বসবাসকারীরা সেখানেই সমবেত হতে পারেন এবং জুমুআ পড়তে পারেন। যাহোক, বিস্তারিত আমীর সাহেবের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট জামা'তের কর্মকর্তাগণ পেয়ে যাবেন। ২০ মাইলের বাইরের যারা সেখানে জুমুআ পড়বে তাদের সম্পর্কেও জানা যাবে যে, সেগুলো কোন্ কোন্ জামা'ত অথবা কীভাবে তাদের বিন্যস্ত করা হবে। যাহোক, পুনরায় আমি একথাই বলবো যে, দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা এই পরিকল্পনা এবং সেখানে স্থানান্তরকে সবদিক থেকে কল্যাণমণ্ডিত করুন।

১ম পাতার শেষাংশ .....

****

হযরত রসুল আকরম (সা.) তাঁকে যখন জিজ্ঞাসা করলেন যে, বাড়িতে কি রেখে এসেছ? তখন তিনি উত্তর দিলেন, 'খোদা এবং তাঁর রসুলকে বাড়িতে রেখে এসেছি।' হযরত আবু বাকার ছিলেন মক্কার একজন সর্দার। অথচ তিনি একজন সাধু-সন্ন্যাসীর মত জীবনযাপন করেছেন এবং সব চেয়ে সাদামাটা পোশাক পরেছেন। তাই এমনটি ধরে নেওয়া উচিত যে, তাঁরা খোদার পথে যেন শহীদ হয়ে গেছেন। তরবারির নীচেই রয়েছে জান্নাত- এই অঘোষিত শ্রুতিই তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করত। কিন্তু আমাদের জন্য তো এতটা কঠোরতা নেই। কেননা, আমাদের জন্য বলা হয়েছে- 'ইয়াযাউল হারব'। অর্থাৎ মাহদীর সময় যুদ্ধ হবে না।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৬-৩৮) (ভাষান্তর: মির্যা সফিউল আলাম)

শেষের পাতার পর.....

দুনিয়া থেকে মুছে না যায় যে, মহানবী (সা.) -এর উচ্চ সাহস ও উদ্যম কিয়ামতকাল ব্যাপী এটিই চেয়েছে যে, ঐশী-বাণীর দুয়ার খোলা থাকুক এবং ঐশী তত্ত্বজ্ঞান, যা নাজাতের ভিত্তিস্বরূপ-লয়প্রাপ্ত না হোক।

(হাকীকাতুল ওহী, পৃ: ২৭-২৮)

'সুবহানাল্লাহ্! সুবহানাআল্লাহ্! হযরত খাতামাল আম্বিয়া (আ.) কত শান ও মর্যাদার অধিকারী নবী! কি আজিমুশ্বান নূর তিনি। যাঁর নগন্য খাদেম, যাঁর তুচ্ছাতিতুচ্ছ উম্মত, যাঁর নগণ্য চাকর উল্লিখিত মর্যাদা ও আধ্যাত্মিক মার্গসমূহ পর্যন্ত পৌঁছে যায়।"

(বারাহীনে আহমদীয়া, পৃ: ২৫৬)

কুরআন শরীফে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, মহানবী (সা.)-এর নূরে নুরান্বিত হয়ে মুহাম্মদ (সা.) নবুওয়্যতের নুরপ্রাপ্ত কেউ নবী হতে পারে। আবার একথাও কুরআন শরীফে আছে যে, এ যুগে ইসলামকে সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করতে একজন নবী আসবেন। (সূরা সাফ, ১০) আজকে এখানে এ

বিষয়ে লেখার সুযোগ হচ্ছে না।

পবিত্র হাদিস 'লা নাবীয়া বা'দী'-এর একটি বিষয় আছে। এখানে সংক্ষেপে এতটুকু উল্লেখ করা হল, 'বা'দী' শব্দের একটি অর্থ আমাকে বাদ দিয়ে কোন নবী আসবে না, যিনি আসবেন তিনি আমার অধীনে আসবেন।

দ্বিতীয় অর্থ হল আমার অল্পকালের মধ্যে কোন নবী আসবেন না। আমার পরে কিয়ামত পর্যন্ত কোন নবী আসবেন না একথা সত্য নয়। অনেক হাদীসে হুযুর (সা.) বলেছেন, হযরত ইমাম মাহদী নবী হয়ে আসবেন। একটি হাদীসে বলেছেন- 'তাঁর [ঈসা (আ.)] ও আমার মাঝে কোন নবী নেই। আমার পরে নবী নাই যতদিন হযরত ঈসা (আ.) না আসবেন। অর্থাৎ যখন ঈসা (আ.) আসবেন তখন তিনি নবী হবেন।

হযরত মহানবী (সা.) বলেছেন-

'হযরত ইমাম মাহদী ও ঈসা (আ.) একই ব্যক্তি হবেন। (ইবনে মাজাহ্, বাব শিদ্দাতুয যামান)

অনেক বড় বড় বুযুর্গ আলেমগণ লিখেছেন যে, কোন নতুন শরীয়ত বহনকারী নবী আসতে পারে না। কিন্তু আঁ হযরত (সা.)-এর উম্মতের মধ্যে হুযুর (সা.)-এর অনুগত নবী আসতে পারেন। এ বিষয়ে আরো তথ্য আছে কিন্তু এখানে এর বেশি লেখার সুযোগ নেই। **"ওয়া আখেরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।"**

(নুরুদ্দীন পত্রিকা থেকে সংগৃহীত, সৌজন্যে: মোরতোজা আলি, বড়িশা)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

'সর্বদা সত্য বল, যখন তোমার কাছে কোন গচ্ছিত সম্পদ রাখা হয়, তখন তা আত্মসাৎ করো না আর সর্বদা প্রতিবেশীদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করো।"

(বাইহাকি, ফি শোয়েবিল ঈমান)

দোয়াপ্রার্থী: আনোয়ার আলি, জামাত আহমদীয়া, অভয়পুরী (আসাম)

২ পাতার পর..

আমার খোঁজ খবর নিতে আসত। এখন আমার মায়ের মৃত্যুতেও এই জামাতের সদস্যরাই শোকজ্ঞাপন করতে এসেছে। এরাই আমার প্রকৃত বন্ধু ও হিতৈষী। এমন সংকট কালে কখনও আমার সহকর্মী ও ব্যবসায়িক সূত্রে বন্ধুদের দেখি নি।" এই ভাবে গ্রামের পঞ্চাশ ষাট বাসিন্দার মনোযোগ আমাদের প্রতি আকৃষ্ট হয় আর আপ্যায়ন কালে প্রায় গোটা সময় জুড়ে জামাতের পরিচিতিই হওয়ার সুযোগ আসে।

হাঙ্গেরী থেকে ভার্গা আন্দ্রাস সাহেব জলসায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি রিফিউজি ক্যাম্পে কাজ করেন। নিজের অভিমত জানিয়ে বলেন: মানুষ যখন কোনও অসাধারণ বিষয়কে দেখে অবাক হওয়ার পাশাপাশি ভিতর ভিতর কেঁপে ওঠে, ঠিক তদ্রূপেই নারা-ধ্বনি উত্থিত করার সময় মনে হচ্ছিল যেন, ইমাম এখন কোন আদেশ দিলে এরা 'লাব্বায়েক' বলে ঝাঁপিয়ে পড়বে। যেন এরা নির্দেশের জন্যই অপেক্ষায় বসে আছে। প্রথমে তো আমি বেশ ভয়ে গুটিয়ে পড়ি। হাঙ্গেরীতে এমন সমাবেশ তো দূরের কথা, একশ মানুষ যদি এক ঘন্টা কোথাও একস্থানে থাকে, তবে তাদের মধ্যে লড়াই বেধে যায়। কিন্তু হাজার হাজার মানুষের এমন শান্তিপূর্ণ সমাবেশ আজকের দিনটির পূর্বে আমি কখনও দেখি নি।

হাঙ্গেরী দলে একজন ইয়েমেন বংশোদ্ভুত চিকিৎসক ওফা হাসান আহমদ সাহেবাও জলসায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। জলসায় অংশগ্রহণ করে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হন। জলসার দ্বিতীয় দিন লাজনাদের উদ্দেশ্যে হুযুর আনোয়ারের ভাষণ তিনি মহিলাদের মার্কিতে বসে শোনেন। এরপর অতিথিদের উদ্দেশ্যে হুযুর আনোয়ারের ভাষনের জন্য তাঁকে পুরুষদের জলসা গাহে পাঠানো হয়। তিনি বলেন, আমি লাজনাদের মার্কিতেই বেশ ছিলাম। আমাকে পুনরায় লাজনাদের মার্কিতে রেখে আসার ব্যবস্থা করুন। জামেয়া পরিদর্শনের সময় তিনি সাগ্রহে লাইব্রেরী দেখেন এবং ইসলামের মূল বই-পুস্তকগুলি দেখেন। বাইরে এসে তিনি বলেন, প্রত্যেকটি আয়াত যথাস্থানে ও উপযুক্ত লেখা রয়েছে' একথা বলে তিনি জামেয়া আহমদীয়ার ভবনের দিকে ইঙ্গিত করেন যেখানে এই আয়াত লেখা ছিল 'ওয়া আশরেকাতিল আরযু বি নুরি রাব্বেহা'। দেখ এই আয়াত কিভাবে একেবারের যথাস্থানে লেখা রয়েছে। সাক্ষাতের পর তিনি বলেন: এখনও পিপাসা নিবারণ হয় নি, অনেক কিছু বলতে থেকে গেল।

মুবাল্লিগ সিলসিলা বলেন: আসার সময় সারা রাস্তায় তিনি হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাতের আদব কায়দা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে থাকেন এবং চিন্তা করতে থাকেন যে জলসা সম্পর্কে কি কথা বলবেন। এখন থেকেই আগামী বছরের পরিকল্পনা বানিয়ে ফেলেছেন। আগামীতে নিজের বোন ও ছেলেকে নিয়ে আসতে চান।

ক্রোয়েশিয়ার এক অতিথি আদম সাহেব বলেন: দুটি জলসা, অর্থাৎ যুক্তরাজ্য এবং জার্মানীতে দুই ভিন্ন ভিন্ন আয়োজন দেখে বিস্মিত হতে হয় যে, কেমন সুচারুরূপে কর্মীরা এই জলসা পরিচালনা করে। তাদের ব্যবস্থাপনা দেখে জামাতের কাজে উৎসাহ সহকারে যোগ দিতে আমার মধ্যেও আবেগ তৈরী হয়। বিশেষ করে আতফালদের পানি পরিবেশন করার ডিউটি দিতে দেখে অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছি যে, এই খুদেরা কিভাবে এই বয়সেই এমন নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করছে।

আদম সাহেবের স্ত্রী নাসেহা সাহেবা বলেন: জলসায় এই নিয়ে আমি ছয় বার অংশগ্রহণ করলাম। সারা পৃথিবী থেকে আসা মানুষদের সঙ্গে সাক্ষাত করে আমি অনেক কিছু শেখার সুযোগ পাই। নিঃসন্দেহে এই জলসা ইসলামী শিক্ষাকে সর্বোত্তম পন্থায় উপস্থাপন করছে এবং এমন এক চিত্র পরিবেশন করছে যে, যদি ইসলামী শিক্ষার উপর আমল করা হয় তবে কোন ধরণের আবেগ তৈরী হয় এবং কোন পরিস্থিতি বিরাজ করে।

ক্রোয়েশিয়া থেকে মিশেল সাহেব যিনি একজন অ-আহমদী, আর জলসায় একজন অনুবাদক হিসেবে কাজ করে থাকেন, তিনি বলেন: জলসার ব্যবস্থাপনা দেখে আশ্চর্য হতে হয় যে, কিভাবে এমন সুন্দর ভাবে আহমদী কর্মীরা জলসার ব্যবস্থাপনা সম্পাদন করে। অনুরূপভাবে নিরাপত্তা ব্যবস্থা দেখে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত।

সাইটোমোর প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাত

সাইটোমের প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ভিলুলডিলি বারোকা সাহেব হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। তিনি সে দেশের প্রধানমন্ত্রীর সংসদীয় বিষয়াদির উপদেষ্টা। আল্লাহ্‌র ফযলে তিনি আহমদীও বটে। তিনি হুযুর আনোয়ারকে বলেন: একজন আহমদী হিসেবে কিভাবে আমি দেশের সেবা করব?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আঁ হযরত (সা.)-এর উক্তি- 'সৈয়্যদুল কওমু খাদিমুহুম' সব সময় স্মরণ রেখে খিদমত করবেন আর জামাত আহমদীয়ার সঙ্গে সম্পর্কের কারণে উন্নত চরিত্রের নেতা হয়ে দেশের সেবা করুন।

তিনি হুযুর আনোয়ারের হাতে বয়আত করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। তিনি এই ঘটনাটি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আজ হুযুরের হাতে বয়আত করার সময় তাঁর হাতের নীচে আমার হাত ছিল। এটি আমার জন্য অত্যন্ত আবেগঘন মূহুর্ত ছিল। একদিকে হুযুর আনোয়ারের হাত স্পর্শ করছিলাম আর অপরদিকে আল্লাহর সঙ্গে এক অঙ্গীকার করছিলাম। আমি অনুভব করছিলাম যেন কোন জিনিস আমার মধ্যে বিলীন হয়ে যাচ্ছে, যেন এক গৌণ মৃত্যু আমাকে ঘিরে ধরছে। একথা বলে তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন।

হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাত প্রসঙ্গে তিনি নিজের অভিমত জানিয়ে বলেন: আমি কতটা সৌভাগ্যবান যে, হুযুর আমাকে সময় দিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে সময় অতিবাহিত করার সুযোগ হয়েছে। অথচ লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছে। এটি হুযুরের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাত ছিল, কিন্তু তাঁর স্নেহ ও ভালবাসার কারণে মনে হচ্ছিল আমি পর নই, বরং তাঁর একান্ত আপন, যে কিনা দীর্ঘকাল পর মিলিত হচ্ছে। হুযুর আনোয়ার এত ভালবাসা ও বিনয়ের সঙ্গে সাক্ষাত করেন যে তাঁকে না ভালবেসে থাকা যায় না।

হুযুর আনোয়ারের প্রতিটি শব্দে এত শিক্ষা রয়েছে যে, মানুষের মন চায় কিছু না বলে কেবল তাঁর কথা শুনতে। হুযুর সর্বপ্রথম আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কি সাউটোমের প্রধানমন্ত্রী? এর উত্তরে আমি বলি, আজ্ঞে না। আমি প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা। যা শুনে হুযুর আনোয়ার সস্নেহে বলেন, ভবিষ্যত প্রধানমন্ত্রী। আমি এই পদ সম্পর্কে কখনো কল্পনা করি নি। এর থেকে বোঝা যায় আমার কাছে হুযুরের অনেক প্রত্যাশা রয়েছে যা পুরণ করতে হলে আমাকে অনেক সংগ্রাম করতে হবে।

হুযুর আনোয়ার বলেছেন, আঁ হযরত (সা.)-এর এই উক্তি 'সৈয়্যদুল কাউমু খাদিমুহু' কখনও ভুলবেন না। এটিকে সব সময় আঁকড়ে ধরবেন। আমার সারা জীবনের শিক্ষার চেয়ে হুযুর আনোয়ারের এই নির্দেশ শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে হুযুর আনোয়ারের নির্দেশের উপর আমল করার তৌফিক দান করুন।

হুযুর (আই.)-এর ভাষণ

তাশাহুদ তাউয ও তাসমিয়া পাঠের পর হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: সম্মানীয় অতিথিবর্গ! আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বরকাতুহূ। আপনাদের সকলের উপর আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে শান্তি ও কৃপা বর্ষিত হোক। যেরূপ একজন শ্রদ্ধেয় বক্তাও বলেছেন, যে আয়াত তিলাওয়াত করা হয়েছিল সেটিতে আমাদেরকে এই শিক্ষাই দেওয়া হয়েছে যে, খোদা তা'লার ইবাদত করার পাশাপাশি তোমাদেরকে পুণ্যকর্মও করে যেতে হবে। প্রকৃত পুণ্য হল মানবতার সেবা করা, দীন-দুঃখী এবং অনাথদের সেবা করা বা এই ধরণের অন্যান্য সেবামূলক কাজ করা। তাই আমরা যখন একটি মসজিদ নির্মাণ করি তখন আমাদের প্রত্যাশা ও উদ্দেশ্য হয়ে থাকে এই শিক্ষার উপর অনুশীলন করা। আমরা একদিকে যেমন ইবাদতের ক্ষেত্রে মসজিদ পূর্ণ রাখব তেমনি মানবতার সেবাও করে যাব।

অতএব এই মৌলিক বিষয়টি একজন আহমদী সব সময় দৃষ্টিপটে রাখে। এই অনুপ্রেরণা নিয়েই আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন দরিদ্র দেশে মানবসেবামূলক কাজ করে চলেছি। একদিকে যেমন আমাদের মসজিদ নির্মিত হচ্ছে সেখানে আমাদের পক্ষ থেকে স্কুলও তৈরী হচ্ছে। আমরাও হাসপাতালও তৈরী করছি বরং এমন নির্ধন দেশ এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেখানে বিদ্যুত ও পানীয় জলের সংকট রয়েছে সেখানে আমরা আদর্শ গ্রাম তৈরী করে গোটা এলাকায় বিদ্যুত ও পানীয় জল সরবরাহ করছি, পূর্বে যা অভাবনীয় বিষয় ছিল।

আমি সবসময় উদাহরণ দিয়ে থাকি যে এই সব উন্নত দেশসমূহে আমরা পানির কদর করি না, অথচ হোটেলে ও অন্যান্য জায়গায় লেখা থাকে যে পানি অপচয় করবেন না। কিন্তু আমরা পানির মূল্য তখনই বুঝতে পারি যখন আফ্রিকার মত দরিদ্র দেশসমূহে প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে দেখি গ্রামের শিশুরা দারিদ্রতার কারণে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং তারা স্কুলে যাওয়ার বদলে মাথায় একটি বালটি বা পাত্র নিয়ে দুই-তিন কিমি রাস্তা হেঁটে নোংরা পুকুর থেকে জল বয়ে আনছে এবং বাড়িতে সেই জল রান্না বা খাওয়ার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

ইমামের বাণী

"যদি তোমরা মুত্তাকি হও আর তাকওয়ার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ পথে পরিচালিত হও, তবে খোদা তোমাদের সঙ্গে থাকবেন।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২০০)

দোয়াপ্রার্থী: বেগম আয়েশা খাতুন, জামাত আহমদীয়া হরহরি, মুর্শিদাবাদ

ইমামের বাণী

"কেবল একটি জিনিষই কুপ্রবৃত্তি এবং শয়তানি প্ররোচনাকে প্রতিহত করতে পারে, যাকে বলা হয় মারেফাতে ইলাহি বা ঐশী-তত্ত্বজ্ঞান।

(মালফুযাত, ২য়খণ্ড, পৃ: ৩)

দোয়াপ্রার্থী: নুর আলাম, জেলা আমীর, জলপাইগুড়ি, (প:ব:)

এমন সব জায়গায় যখন আপনি পরিশ্রুত পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত করেন বা হ্যান্ডপাম্পের ব্যবস্থা করেন, তখন তাদের আবেগ ও উচ্ছাস দেখে অভিভূত হতে হয়। তাদের আনন্দের সীমা থাকে না। পাশ্চাত্যে ইউরোপের দেশগুলিতে বা এখানে ইংল্যান্ডেও মানুষ লটারি জিতে থাকে। কেউ হয়তো কয়েক কোটি ডলার বা পাউন্ডের পুরস্কার জিতে। এরফলে এরা ভীষণ আনন্দিত হয় এমনকি আনন্দে নাচতে আরম্ভ করে দেয়। কিন্তু যদি সেই অনুভুতি ও আনন্দটুকু অনুভব করেন তবে বুঝবেন যে ঐ সব হতদরিদ্র কিশোরদের বাড়ির সামনে পানীয় জলের সরবরাহ হলে যে আনন্দ লাভ তা কয়েক কোটি ইউরোর লটারি জেতার মত ব্যাপার।

আমরা এ বিষয়টি অনুভব করি এবং এই কারণেই আমরা একদিকে যেমন আল্লাহ্‌র দিকে মানুষকে আহ্বান করি, তেমনি মানবতার সেবার কাজও করে থাকি। এই উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্ তা'লা জামাতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-কে প্রেরণ করেছেন যিনি মহানবী (সা.)-এ ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে এসেছেন। মহানবী (সা.) বলেছিলেন, এমন এক সময় আসবে যখন মুসলমানদের অধিকাংশই ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে ভুলে বসবে, সেই সময় এক ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'লা প্রেরণ করবেন যিনি ইসলামের সঠিক শিক্ষাকে নতুনরূপে জীবন দান করবেন এবং পৃথিবীতে প্রকৃত ইসলামের প্রচার ও প্রসার করবেন। আমরা জামাতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতার কাছ থেকে এই শিক্ষাই পেয়েছি। তিনি বলেন, উগ্রবাদ, সন্ত্রাস, (তরবারির) জিহাদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ-এগুলি ইসলাম নয়। প্রকৃত ইসলাম হল বান্দার সঙ্গে আল্লাহ্‌র মিলন সাধন বা নিজে খোদার সাক্ষাত লাভ করা। তিনি এটিকে নিজের আগমণের উদ্দেশ্য বলেছেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি বলেন, একে অপরের অধিকার প্রদান কর। এই দুইটি বিষয় জামাতে আহমদীয়ার শিক্ষার ভিত্তি আর মূলত এই দুইটি বিষয়কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর খিলাফত এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

একটি খিলাফত যা সারা পৃথিবীতে বিখ্যাত হয়েছে যেটিকে দাঈশ বলা হয়। সারা পৃথিবীতে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে রেখেছে। সর্বত্র সন্ত্রাসের রাজত্ব তৈরী করেছে। শুধু পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে নয়, তাদের নিজেদের দেশেও। ইরাক, সিরিয়া এবং অন্যান্য দেশে হাজার মানুষ নিরীহ মানুষকে অকারণে হত্যা করা হয়েছে। এটি খিলাফত নয়, কেননা তারা সঠিক ইসলামের শিক্ষা অনুসারে চলছে না। এটি খিলাফত হতেও পারে না, কেননা, এটি সেই পদ্ধতিতে সূচীত হয় নি যা ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মহম্মদ (সা.) ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখ করেছিলেন। প্রকৃত খিলাফত সেই সময় প্রতিষ্ঠিত হওয়া নির্ধারিত ছিল যখন আল্লাহ্ তা'লা প্রেরিত প্রতিশ্রুত মসীহ -এর আবির্ভাব এবং তাঁর তিরোধানের পর তাঁর সেই অপূর্ণ কাজকে খিলাফতের ধারা অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে যে কাজের জন্য আল্লাহ্ তা'লা তাকে প্রত্যাদিষ্ট করেছিলেন। আর সেই কাজ হল, যেরূপ আমি উল্লেখ করেছি, আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে বান্দার মিলন সাধন করা এবং পরস্পরের অধিকার প্রদান করা। অতএব প্রকৃত খিলাফত এবং কৃত্রিম খিলাফতের মধ্যে এটি মূল পার্থক্য। এই বিষয়টি সব সময় মনে রাখতে হবে। এই কারণে ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে কোন অ-মুসলিমের ভীত হওয়া বা সংরক্ষণশীল হওয়ার প্রয়োজন নেই।

মেয়র সাহেব বলেছেন যে, এই অঞ্চলে মসজিদে আমরা একটি গাছ লাগিয়েছি। বৃক্ষরোপণ বাহ্যতঃ সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির কারণে করা হয়ে থাকে বা ফল বিশিষ্ট গাছ ফল নেওয়ার জন্য লাগানো হয়ে থাকে বা পরিবেশকে সবুজ ও মনোরম রাখার জন্য বা পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য লাগানো হয়ে থাকে। বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি প্রবল হয়ে দেখা দিখেছে। পরিবেশ দূষণের মাত্রা সীমা ছাড়িয়েছে। এই কারণেও বৃক্ষ রোপন করা হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের এই বাহ্যিক বৃক্ষ ভালবাসার বৃক্ষও বটে। আমাদের উদ্দেশ্য সেই বৃক্ষ রোপণ করা যা বাহ্যিকভাবে যেমন পরিবেশের সৌন্দর্যের কারণ হবে, পরিবেশকে স্বচ্ছ ও নির্মল রাখতে সাহায্য করবে, ফল দান করবে, অনরূপভাবে তা ভালবাসার ফলও যেন ধারণ করে, আমাদের প্রতিবেশীরা আমাদের কাছ থেকে যেন অনেক অনেক ভালবাসা এবং নিজেদের অধিকার লাভের বার্তা পেয়ে থাকে। অতএব বৃক্ষ হিসেবে এটি হল বাহ্যিক ভূমিকা। এর পাশাপাশি গাছের অন্য একটি আধ্যাত্মিক ভূমিকাও রয়েছে যা আমাদের প্রত্যেক আহমদী মাথায় রাখে এবং এটি রাখা উচিত।

আমাদের এম.পি সাহেবাও যথার্থ বলেছেন। আমি তাঁর আবেগ ও অনুভুতির জন্য ধন্যবাদ জানাই। তিনি বলেন, এখানে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া রয়েছে। জামাত আহমদীয়ার মধ্যেও এই গুণটি রয়েছে এবং ইনশাল্লাহ্ মসজিদ নির্মাণের পর এই বোঝাপড়া আরও উন্নতি লাভ করবে।

আমরা পৃথিবীর সর্বত্র মতানৈক্যের বিরুদ্ধে সরব হই। সর্বত্র সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হই এবং আমাদের উদ্দেশ্য হল পৃথিবী যেন মতানৈক্য দূর করে পরস্পর প্রেম-প্রীতি ও সৌহার্দ্যতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

পৃথিবীতে বিভিন্ন ধর্ম রয়েছে, বরং আমরা মুসলমানদের বিশ্বাস, আল্লাহ তা'লা পৃথিবীর সমস্ত জাতির মধ্যে তাঁর নবী ও প্রত্যাদিষ্ট পুরুষদেরকে পাঠিয়েছেন যারা তাদের কাছে আল্লাহ্‌র তা'লার বাণী পৌঁছে দিয়েছেন। আর প্রত্যেক জাতিতে প্রত্যেক নবী ও প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ এই বাণী নিয়ে এসেছেন যে, আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং পুণ্যের প্রসার কর। আর ইসলামও এই একই শিক্ষা দেয়। আমাদের বিশ্বাস এই শিক্ষার মধ্যে আরও ব্যপকতা দান করে কুরআন করীমে সবিস্তারে এই শিক্ষাকে বর্ণনা করা হয়েছে।

মানুষ মনে করে যে, কুরআন করীমে জিহাদের বিষয়ে আদেশ রয়েছে, অর্থাৎ সন্ত্রাস করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। এই কারণে মুসলমানরা সন্ত্রাসী। অথচ কুরআন করীমে শান্তি ও সম্প্রীতির শিক্ষা অনেক বেশি দেওয়া হয়েছে। কোথাও জিহাদের শিক্ষা দেওয়া থাকলেও তা দেওয়া হয়েছে কিছু শর্ত সহকারে। এখানে একটি বিষয় বোঝার আছে যে, জিহাদের প্রকৃত অর্থ হল প্রচেষ্টা আর সেটি হলে মন্দকে প্রতিহত করার প্রচেষ্টা। আর এটিই প্রকৃত জিহাদ যা জামাত আহমদীয়া করে চলেছে। এক সময় মুসলমানদের উপর আক্রমণ করা হত। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, আঁ হযরত (সা.) তাঁর যুগে কারোর উপর কোন অত্যাচার করেন নি, বরং তাঁরই উপর ভীষণ অত্যাচার ও উৎপীড়ন চালানো হয়েছে। সেই সময় তাঁকে আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে এসবের জবাব দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়, তাও এই শর্তের সঙ্গে যে, কুরআন করীমে একথা লেখা আছে, অত্যাচারীরা ধর্মকে সমূলে উৎপাটন করতে চায়। কেবল ইসলাম ধর্মকেই নয়, কুরআন করীমে স্পষ্ট লেখা আছে, যদি তোমরা তাদেরকে প্রতিহত না কর তবে আল্লাহ্‌র নাম নেওয়ার মত কোন গীর্জা অবশিষ্ট থাকবে না, আর না থাকবে কোন সেনাগগ, না কোন মন্দির বা মসজিদ। কুরআন করীম এমন স্পষ্টভাষায় বর্ণনা করে দিয়েছে। অতএব কোন প্রকৃত মুসলমান যে মসজিদেও যায় সে কখনও অন্য ধর্মের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নিতে পারে না। একথা ঠিক যে, যখন মুসলমানদের উপর আক্রমণ হয়েছে তখন সেই আক্রমণের উত্তর অবশ্যই দেওয়া হয়েছে। এই কারণেই আঁ হযরত (সা.) একটি যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে বলেন, আমরা ক্ষুদ্র জিহাদ থেকে যা আমাদের উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, বৃহত্তর জিহাদের দিকে ফিরে যাচ্ছি, যেখানে আমরা ভালবাসার শিক্ষার প্রচার করব, কুরআনের শিক্ষার প্রসার করব এবং পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধি করব। এই প্রকৃত ইসলামের উপর জামাত আহমদীয়া অনুশীলন করে থাকে। বর্তমানে প্রত্যেক মুসলমানকে ইসলামের এই প্রকৃত শিক্ষাকেই মেনে চলা প্রয়োজন।

ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মহম্মদ (সা.) এর নির্দেশ ছিল, যখন সেই ব্যক্তি আসবেন যিনি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা বর্ণনা করবেন এবং এর প্রসার করবেন তখন তাঁকে মান্য করো। অতএব জামাতে আহমদীয়ার এই শিক্ষা, ' ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারোর তরে' নতুন নয় বরং এটি ইসলামের মৌলিক শিক্ষা এবং যা কুরআন করীমে বর্ণিত হয়েছে এবং যেটিকে মুসলমান আলেমগণ নিজেদের ব্যক্তি-স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে বিকৃত রূপে উপস্থাপন করে থাকে। আর মুসলমানদের এমন সৌভাগ্য হয় নি যে, তারা নিজে কখনও ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা যাচাই করে দেখবে। এই ভুল নেতৃত্বই মুসলমানদেরকে বিপথে পরিচালিত করেছে। ইসলামের প্রকৃত নেতৃত্ব সেটিই যা মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আত্মপ্রকাশ করেছে এবং এটিকে এখন জামাত আহমদীয়া এগিয়ে নিয়ে চলেছে। এটিই হল ইসলামে প্রকৃত ও মৌলিক শিক্ষা আর এটিই মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্য। এই কারণে আমাদের প্রতিবেশীদের মনেও যদি রক্ষণশীল মনোভাব থাকে তবে তা এখন দূর করা উচিত। কেননা, মসজিদের উদ্দেশ্য একদিকে যেমন ইবাদত করা, তেমনি অপরদিকে মানুষের অধিকার প্রদান করা, প্রতিবেশীদের অধিকার প্রদান করা এবং শান্তি ও নিরাপত্তার বাণী পৌঁছে দেওয়া।

ইসলাম শব্দের অর্থই হল শান্তি ও নিরাপত্তা। ধর্মের ভিন্নতার উর্দ্ধে, আমরা এই দৃঢ় বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত যে খোদা তা'লা হলেন বিশ্ব-জগতের প্রভু-প্রতিপালক। তিনি সমস্ত মানুষের প্রভু-প্রতিপালক। তাঁর নিয়মের অধীনে তিনি যেমন ধর্মের মান্যকারীদেরকেও বাহ্যিক উপায়-উপকরণ দান করছেন, অনুরূপভাবে ধর্মের অস্বীকারকারীদেরকেও সেই সব কিছুই দান করছেন।

আমাদের ঈমান অনুসারে মানুষের হিসেব-নিকেশ মৃত্যু পর অবধারিত আছে। অতএব আমাদের এই অধিকার জন্মায় না যে, এই পৃথিবীতে কে কেমন তা বিচার করা। এটা ঠিক যে, সঠিক শিক্ষার প্রচার ও প্রসার করা, ভালবাসা ছড়িয়ে দেওয়া, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আসার বাণী পৌছে দেওয়া-এগুলি আমাদের কর্তব্য যা আমরা করে চলেছি এবং ইনশাল্লাহ্ ভবিষ্যতেও করে যাব। আমি আশা করি এই মসজিদটি নির্মিত হওয়ার পর এখানে বসবাসকারী আহমদীরা এই কাজে পূর্বের চেয়ে বেশী মনোযোগী হবে। পূর্বের থেকে বেশি মসজিদে এসে সঠিক অর্থে ইবাদত করবে এবং নিজেদের প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব, সঙ্গীদেরকে অধিকার দিবে এবং আমাদের পক্ষ থেকে সব সময় পূর্বের চেয়ে বেশি ভালবাসার বাণী শোনাবেন। আল্লাহ্ করুন তিনি যেন এমনটি করেন। ধন্যবাদ।

ইমামের বাণী

" যে ব্যক্তি ইসলামের সম্মানের জন্য আত্মাভিমান রাখে না, খোদা তা'লা তার সম্মান ও আত্মাভিমানের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন না। "

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১১১)

দোয়াপ্রার্থী: শামসের আলি, জেলা আমীর, বীরভূম

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সুমহান মর্যাদা

মওলানা মহম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী,
প্রিন্সিপাল জামিয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

মহানবী (সা.)-এর পবিত্র নাম

'আর যারা ঈমান এনেছে এবং ঈমানের সাথে সংগতিপূর্ণ কর্তব্য পালন করেছে আর যা মুহাম্মম (সা.)-এর প্রতি নাযেল হয়েছে তার প্রতিও ঈমান এনেছে।" (সূরা মহম্মদ: ৩)

হযরত নবী করীম (সা.)-এর নামের মধ্যে সবচেয়ে বড় সত্য প্রকাশিত হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নাম মুহাম্মদ আল্লাহ্ তা'লা রেখেছেন। মুহাম্মদ অর্থ 'প্রশংসতি'। আল্লাহ্ তা'লা রহমান। রহমানের তাজাল্লিয়াতে (ঐশী বিকাশে) মুহাম্মদ (সা.)-এর সৃষ্টি। আল্লাহ্ প্রশংসাকারী আর মুহাম্মদ প্রশংসিত। কত বড় বিষয়। আল্লাহ্ প্রশংসা করেছেন বলেই মুহাম্মদ (সা.) প্রশংসিত বা মুহাম্মদ হয়েছেন। কুরআন শরীফে অনেক আয়াত আছে যেখানে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উচ্চ মর্যাদার কথা বড় স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়েছে।

"নিশ্চয় তোমাদের প্রত্যেক এমন ব্যক্তির জন্য আল্লাহ্র রসুলের মাঝে উত্তম আদর্শ রয়েছে, যে আল্লাহ্র ও পরকালের সাক্ষাতকে বিশ্বাস করে, আল্লাহ্কে অনেক স্মরণ করে।

(সূরা আহযাব: ২২)

হুযুর (সা.) আমাদের জন্য যে উত্তম আদর্শ বা নমুনা রেখে গেছেন আমল করে দেখিয়েছেন আমরা যদি তা অনুকরণ করি তাহলেই যথেষ্ট। আমাদের এমন কিছু করার প্রয়োজন নেই যা হুযুর (সা.) করেন নি। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন, " আমি তোমাদের বলতে চাই, অনেক মানুষ আছে যারা নিজেরা যিকর রচনা করেছে, বিভিন্ন ওজিফা বা যিকর রচনা করেছে, তারা তাদের সেসব যিকরের মাধ্যমে রূহানী উন্নতি করতে চায়। কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, হুযুর (সা.) যে পদ্ধতি গ্রহণ করেন নি তা অযথা ও অতিরিক্ত। মহানবী (সা.)-এর চেয়ে বড় আল্লাহ্র নেয়ামত লাভের সত্যিকার অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আর কে হতে পারে। মহানবী (সা.) খাতামান্নাবীঈন। অতএব তিনি যে পথ অবলম্বন করেছেন সেই পথই সর্বোত্তম, সবচেয়ে সঠিক এবং আল্লাহ্র নিকটের পথ। আঁ হযরত (সা.)-এর পথকে ছেড়ে দিয়ে অন্য কোন পথ আবিষ্কার করা তা বাহ্যত যত চমৎকারই হোক না কেন আমার মতে ধ্বংসের পথ। আল্লাহ্ তা'লা আমার কাছে এমনটিই প্রকাশ করেছেন।"

" আঁ হযরত (সা.) -এর সঠিক অনুকরণ ও অনুসরণের মাধ্যমে খোদাকে পাওয়া যায়। হুযুর (সা.)-এর অনুসরণ না করে যদি কেউ সারা জীবন সিজদা করে জীবন কাটায় তবুও সে কোন উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারবে না। .... আঁ হযরত (সা.)-প্রদর্শিত পথ পরিত্যাগ করো না।.... আল্লাহ্ তা'লা আঁ হযরত (সা.) সম্পর্কে বলেছেন, 'লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসুলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানাহ।' হুযুর (সা.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করো। একবিন্দুও এদিক সেদিক হতে চেষ্টা করো না।"

'সাহাবায়ে কেরামের জামাত এমন একটি জামাত ছিল যা কখনো হুযুর (সা.)-এর থেকে পৃথক হতেন না। হুযুর (সা.)-এর পথে নিজেদের প্রাণ দিতেও দ্বিধাবোধ করতেন না বা করেন নি।
(তফসীর হযরত মসীহ মওউদ (আ.), ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৯)

মহানবী (সা.)-কে আল্লাহ্র প্রতিনিধি বানানো হয়েছে। মানুষকে বলা হয়েছে তোমরা মহানবী (সা.)-এর রঙে নিজেকে রঙ্গীন করো তাহলে আল্লাহ্র রহমত লাভ করবে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন:

" (তিনি) (সা.) আল্লাহ্র দিকে আল্লাহ্র নির্দেশে আহ্বানকারী এবং দীপ্তিমান সূর্যের মত এবং মুমিনদের সু-সংবাদ দিয়ে যাও (এই) যে, তাদের জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অনেক বড় ফযল (অনুগ্রহ) । [

সূরা আহযাব: ৪৭-৪৮)

অর্থাৎ যারা আঁ হযরত (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনবে তারা সবাই হুযুর (সা.)-এর থেকে নূর পাবে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) লিখেছেন-

" এক গ্রামে এক বাড়ি ছিল এবং কেবল ঐ বাড়িতেই একটি প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত ছিল। যখন মানুষ জানতে থাকল তখন তারা নিজেদের প্রদীপ নিয়ে বাড়িতে গেল এবং প্রত্যেকে নিজেদের প্রদীপ জ্বালিয়ে নিয়ে গেল। এভাবে সকলের বাড়ি আলোকিত হয়ে গেল। এভাবে একটি প্রদীপ থেকে বহু প্রদীপ জ্বলতে পারে। (উপরোক্ত আয়াতে এটিকেই নির্দেশ করা হয়েছে। [তিনি (সা.)] আল্লাহ্র আদেশে সকলকে আল্লাহ্র দিকে আহ্বানকারী এবং সিরাজাম মুনীরা আলোকিত সূর্যের মত।"

" আল্লাহ্র পক্ষ থেকে রূহানী (আধ্যাত্মিক সংশোধন বা তরবীয়তের জন্য যারা মনোনীত হন তাঁরা প্রদীপের মত হয়ে থাকেন। এজন্য আল্লাহ্ তা'লা কুরআন শরীফে আঁ-হযরত (সা.)-এর নাম 'দাঈয়ান ইলাল্লাহ্' এবং 'সীরাজাম মুনীরা' রেখেছেন। দেখ! কোন অন্ধকার বাড়িতে পঞ্চাশ বা একশ মানুষ থাকে এবং তাদের কোন ব্যক্তির কাছে যদি প্রদীপ থাকে তাহলে সবাই তার প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং ঐ প্রদীপ সকল অন্ধকারকে দূর করে দিবে এবং সবাইকে আলোকিত করবে।"

(তফসীর হযরত মসীহ মওউদ (আ.), ৩য় খণ্ড, পৃ: ৯৪)

একদিন সারা পৃথিবীর মানুষ সকল দেশের মানুষ নবী করীম (সা.)-এর আলোয় আলোকিত হবে, ইনশাআল্লাহ॥

"মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের মাঝে কারো পিতা নন। কিন্তু তিনি আল্লাহ্র রসূল এবং নবীগণের মোহর। আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ে পুরোপুরি অবহিত।

(সূরা আহযাব: ৪১)

খাতামান্নাবীঈন

আহমদীয়া মুসলিম জামাত হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে সকল অর্থে খাতামান্নাবীঈন বলে বিশ্বাস করে। যতগুলো অর্থ করা সম্ভব সকল অর্থেই আমরা হুযুর (সা.)-কে খাতামান্নাবীঈন বলে বিশ্বাস করি। দেখুন হযরত মির্যা গোলাম আহমদ, মসীহ মওউদ (আ.) কী বলেছেন:

" আমি সেই আল্লাহ্র শপথ করে বলছি, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন এবং যাঁর প্রতি মিথ্যা আরোপ করা মহাপাপী ব্যক্তির কাজ, আল্লাহ্ আমাকে মসীহ মওউদ (প্রতিশ্রুত মসীহ) রূপে পাঠিয়েছেন। "

(একটি ভুল সংশোধন, পৃ: ৯-১০)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) আরো বলেছেন, " আমার বিরুদ্ধে এবং আমার জামাতের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় যে, আমরা হযরত মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.)-কে খাতামান্নাবীঈন বলে বিশ্বাস করি না। এটি আমাদের বিরুদ্ধে একটি বিরাট মিথ্যা রচনা করা হয়েছে। আমরা এত বেশি জোরালোভাবে, দৃঢ় বিশ্বাস, মারেফত এবং বাসিরাতের সাথে আঁ হযরত (সা.)-কে খাতামান্নাবীঈন বলে মান্য করি ও বিশ্বাস করি যে, এর লক্ষভাগের একভাগও তারা বিশ্বাস করে না।

(আল হাকাম, ১৭ মার্চ ১৯০৫)

হুযুর (আ.) বলেছেন,

'মুহাম্মদ (সা.) তোমাদের প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের মধ্যে কারও পিতা নন, কিন্তু তিনি আল্লাহ্র রসূল এবং খাতামান্নাবীঈন। "

এটি স্পষ্ট যে, 'লাকিন' অর্থাৎ 'কিন্তু' শব্দটি আরবী ভাষায় বাক্যের প্রথমাংশে বর্ণিত ত্রুটি-বিচ্যুতি দূরিকরণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। (ব্যাকারণে যাকে 'ইস্তেদরাক' বলা হয়)। সুতরাং উক্ত আয়াতের প্রথমাংশে মহানবী (সা.)-এর পবিত্রতম সত্তায় যে ত্রুটি ও বিচ্যুতিমূলক নেতিবাচক বিষয়টির প্রতিকার ও অপনোদন করে আঁ হযরত (সা.)-কে 'খাতামান্নাবীইন' সাব্যস্ত করা হয়েছে। এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, তাঁর পক্ষে প্রত্যক্ষ ও সরাসরিভাবে নবুয়ুতের পরিপূর্ণ কল্যাণ কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিই পেতে পারেন যিনি নিজের সকল আমল বা কর্মের উপর তাঁর (সা.) নবুয়্যতের আনুগত্য ও অনুবর্তিতার মোহর রাখবেন এবং এইরূপে যিনি আঁ হযরত (সা.)-এর রূহানী পুত্র ও তাঁর উত্তরাধিকারী হবেন।

(রিভিউ বর মোবাহাসা বাটালবী ও চকড়ালবী, পৃ: ৬-৭)

হুযুর (আ.) আরো বলেন,

" এরূপ হতভাগ্য মিথ্যে দাবিকারক ব্যক্তি যে নিজে রিসালত ও নবুয়্যতের দাবি করে সে কি কুরআন শরীফে ঈমান রাখতে পারে? পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি পবিত্র কুরআনে ঈমান রাখে এবং 'ওয়া লা-কির রাসুলাল্লাহি ওয়া খাতামান্নাবীঈন' আয়াতকে খোদার কালাম বলে দৃঢ় বিশ্বাস করে সে কি বলতে পারে যে, সেও আঁ হযরত (সা.)-এর পরে নবী ও রসূল? ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিদের স্মরণ রাখা উচিত যে, এই অধম কস্মিনকালেও মৌলিকভাবে (তথা রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর পূর্ণ অনুবর্তিতা ব্যতিরেকে এবং স্বাধীন ও সতন্ত্রভাবে-অনুবাদক) নবুওয়াত বা রিসালতে দাবি করতে পারে নি।"

(আঞ্জামে আথাম, পৃ: ২৭-২৮, পাদটিকা)

হযরত মসীহ মওউদ (আ. বলেছেন,

" যখন আমরা ন্যায় -বিচারের দৃষ্টিতে দেখি, তখন নবুওয়্যতের সমগ্র শিক্ষাদিক্ষার মধ্যে মাত্র এমন একজনকে দেখতে পাই যিনি সর্বোচ্চ মর্যাদার সাহসী নবী, জীবন্ত নবী এবং খোদা তা'লার অত্যুচ্চ মর্যাদার প্রিয় নবী, এবং যিনি নবীগণের নেতা, রসূলগণের গৌরব এবং সকল প্রেরিত পুরুষগণের মাথার মুকুট, এবং তাঁর নাম মুহাম্মদ মুস্তফা আহমদ মুজতবা (সা.)। তাঁর ছায়ার মধ্যে দশদিন চলতে পারলেই সেই আলো লাভ করা যায়, যা ইতিপূর্বে হাজার বছরেও লাভ করা সম্ভব হত না।"

(সীরাজে মুনীর, পৃ: ৮২)

হুযুর (আ.) আরো বলেছেন, "মোটকথা, আমাদের ধর্মমত হচ্ছে এই, যে ব্যক্তি মৌলিক অর্থে নবুওয়্যতের দাবি করে এবং আঁ হযরত (সা.)-এর রূহানী বরকত ও কল্যাণের আঁচল থেকে নিজেকে পৃথক রেখে এবং হুযুর (সা.)-এর পবিত্র উৎস হতে আলাদা হয়ে নিজেকে সরাসরি আল্লাহ্র নবী হয়ে যেতে চায় সে মুলহেদ ও বেদ্বীন (বিধর্মী) বৈ কিছু নয়।"

(আঞ্জামে আথম, পৃ: ২৭)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 4 Thursday, 16 May, 2019 Issue No.20

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

অনেক বড় প্রশ্ন হল এই ,হযরত ঈসা (আ.) একজন বনী ইসরাঈলী নবী। তিনি জীবিত আছেন। তিনি যখন আসবেন তখন শেষ নবী কে হবেন? এটি কি সম্ভব! হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর খাতাম্মান্নাবীঈন হওয়ার বিষয়টি আমাদের ও অন্যদের মধ্যে বিতর্কের মূল বিষয় নয়। পৃথিবীর সকল মুসলমান যেভাবে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে শেষ নবী বলে বিশ্বাস করে আমরাও সেভাবেই বিশ্বাস করি। তারাও হযরত ঈসা (আ.)-এর পুনরায় আগমণ বিশ্বাস করে, আমরাও হযরত ঈসা (আ.)-এর পুনরায় আগমণে বিশ্বাস করি। তারা হযরত মরিয়মের পুত্র ঈসা (আ.)-এর আগমণে বিশ্বাসী হয়েও হযরত মুহাম্মদ (সা.)কে শেষ নবী বলে বিশ্বাস করে। এতে তাদের কোন অসুবিধা হয় না। তারা বলছে, হযরত ঈসা (আ.) উম্মতি হয়ে আসবেন। আমরাও বলছি হযরত ঈসা (আ.) উম্মতি হয়ে আসবেন। তারা বলছে হযরত ঈসা (আ.) শুধুমাত্র উম্মতি হয়ে আসবেন, নবী হবেন না। এখানেই তাদের সাথে আমাদের পার্থক্য। আমরা বলছি হযরত ঈসা (আ.) উম্মতি হয়ে আসবেন এবং নবীও হবেন। নবুওয়ত হারাবেন না। কারণ কুরআন শরীফে তাঁকে নবী বলা হয়েছে। কুরআন পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। যখন হযরত ঈসা (আ.) হাজির হবেন তখন কে বলবে যে তিনি নবী নন?

আমরা বিশ্বাস করি হযরত মরিয়ম তনয় ঈসা (আ.) মারা গেছেন। তিনি স্বশরীরে আর আসতে পারেন না। তিনি যদি আসেন তাহলে শেষ নবী কে হবেন? আমরা বিশ্বাস করি ঐ ঈসা (আ.) আসবেন না। এখন রূহানীভাবে ঈসা (আ.)-এর গুণে গুণান্বিত হয়ে একজন জন্ম নিবেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মতি হবেন। উম্মতি হয়ে নবুওয়ত প্রাপ্ত হওয়াতে খতমে নবুয়তের মোহর ভঙ্গ হয় না। কুরআন ও হাদীসে কোথাও একথা লেখা নেই যে, হযরত ঈসা (আ.) দ্বিতীয়বার যখন আসবেন তখন তিনি নবী হবেন না। বরং কুরআন, হাদীস এবং অন্য আলেমদের বইতে লেখা আছে যে, হযরত ঈসা (আ.) উম্মতি নবী হয়ে আসবেন। যেমন-

১- সহী বুখারীতে দেখুন, ঈসা ইবনে মরিয়ম নাযেল হবেন এবং তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের ইমাম হবেন।

২- সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল ফিতন, বাব যিকরুদ দাজ্জাল হাদীসে দেখুন, হযরত ঈসা (আ.)-কে চারবার 'নবীউল্লাহ্' বলা হয়েছে।

৩- সহী বুখারী শরীফে ব্যাখ্যায় লেকা হয়েছে: 'হাকামান আদালান-নেতৃত্ব ও সুবিচারক ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারী" অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ.)-এর তৎকালীন আগমণ ভিন্ন নবী ও ভিন্ন শরীয়তের বাহকরূপে হবে না বরং তিনি ব্যক্তিগতভাবে নবী থাকবেন বটে, কিন্তু তিনি মুহাম্মদ (সা.)-এর শরীয়ত মোতাবেক ফয়সালাকারী এবং সকল প্রকার অন্যায় ও অত্যাচার দূর করে ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারী রূপে আগমণ করবেন।" (বুখারী শরীফ, বাংলা অনুবাদ ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪১৭, অনুবাদক: মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (রহ.) এবং মাওলানা আজিজুল হক সাহেব-শায়খুল হাদীস জামিয়া রহমানিয়া সাত মসজিদ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।)

৪- হযরত মুহাম্মদ (সা.) নির্দেশ দিয়েছেন-

" যখন তোমরা হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর সংবাদ পাবে তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর হাতে বয়আত গ্রহণ করবে, (এজন্য) যদি তোমাদের বরফের পাহাড়ের উপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়েও যেতে হয় (তবুও যাবে) কারণ তিনি ' আল্লাহ্‌র খলীফা আল মাহদী'। (ইবনে মাজা, বাব খুরুজুল মাহদী)। এখানে খলীফাতুল্লাহ্ অর্থ নবী আল মাহদী অর্থ অনুসারী বা উম্মতি। কোন আলেম একথা অস্বীকার করতে পারেন না যে, খলীফাতুল্লাহ্ অর্থ নবী। বিগত ১৩০০ বছর ধরে অনেক উলামায়ে কেরাম লিখে আসছেন যে, হযরত ঈসা (আ.) যখন পুনরায় আসবেন তিনি নবী হয়েই আসবেন। কোথাও লিখা হয় নি যে, হযরত ঈসা নবী হবেন না।

৫- হযরত আয়েশা (রা.), যাঁর সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেন যে অর্ধেক দ্বীন আয়েশার নিকট শেখো, বলেন-

'তোমরা আঁ হযরত (সা.)-কে খাতামুল আম্বিয়া বল কিন্তু একথা বলো না যে, তাঁর পরে কোন নবী নেই।

(তফসীর দুররে মনসুর, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২০৪)

৭-হযরত ইমাম মুহাম্মদ তাহের, প্রখ্যাত মুহাদ্দেস বলেছেন- 'হযরত আয়েশা (রা.) এজন্য একথা বলেছেন যে, হযরত ঈসা (আ.) আসবেন। তাছাড়া হুযুর (সা.)-এর হাদীস - 'লা নাবীয়্যা বাদী'র অর্থ হচ্ছে শরীয়তধারী কোন নবী আসবেন না।

(তাকমেলা মজমাউল বিহার, পৃ: ৮৫)

৮- আল্লামা জালালুদ্দিন সিউতি (রহ.) তফসীর জালালাইন-এর লেখক ও ৯ম শতাব্দীর মুজাদ্দেদ বলেছেন-

' যে ব্যক্তি বলবে হযরত ঈসা (আ.) নবী হবেন না, যে কাফের হবে।'

(হুজ্জাতুল কেরামাহ, পৃ: ৪৩১)

৯- হযরত মহিউদ্দীন ইবনে আরাবী (রহ.) বলেছেন, 'হযরত ঈসা (আ.) আমাদের মধ্যে আগমণ করবেন; তিনি নিঃসন্দেহে নবী হবেন।' অর্থাৎ উম্মতি নবী।

(ফতুহাতে মাক্কিয়া, ১ম খন্ড, পৃ: ৫৭০)

এই ধরণের বহু আলেমগণের বক্তব্য পেশ করা যেতে পারে। আরো অনেক হাদীসও পেশ করা যেতে পারে। প্রশ্ন হলো যারা বলেন যে, হযরত ঈসা যখন আসবেন তিনি নবী হবেন না, কেবলমাত্র উম্মতী হবেন; নবী হবেন না একথা কিসের ভিত্তিতে বলেন? এমন কথা কে বলেছে? কিভাবে একথা বলা সম্ভব? যেখানে কুরআন শরীফে বহু আয়াতে লেখা আছে যে, তিনি বনী ইসরাইলী নবী ছিলেন। কেউ তাঁর নবুয়ত কেড়ে নিতে পারবে না। অতএব, ঐ দুই হাজার বছর পূর্বে যার জন্ম সেই ঈসা (আ.) স্বশরীরে আসতে পারেন না।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন,

" আমি দৃঢ় বিশ্বাস এবং দাবীর সাথে বলছি, মহানবী (সা.)-এর উপর খাতমে নবুয়্যতের কামালাত বা পরম পরাকাষ্ঠা পূর্ণ হয়েছে। যে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারী যে তাঁর বিপরীতে আলাদা কোন সিলসিলা প্রতিষ্ঠা করে এবং তাঁর নবুওয়ত হতে পৃথক হয়ে আলাদা কোন সত্য পেশ করে এবং মুহাম্মদী নবুওয়তের উৎসকে ত্যাগ করে। আমি খোলাখুলি ভাবে বলছি যে, সে ব্যক্তি অভিশপ্ত যে আঁহযরত (সা.)-কে ছেড়ে তাঁর পরে অন্য কাউকে নবী বলে বিশ্বাস করে এবং তাঁর খতমে নবুওয়তকে ভঙ্গ করে। এ কারণেই এরূপ কোন নবী আসতে পারে না যার উপর মুহাম্মদী নবুয়্যতের মোহর থাকে না। "

(আল-হাকাম, ১০ ই জুন, ১৯০৫)

খোদা তা"লা যেখানেই এই অঙ্গীকার করেছেন যে, মহানবী (সা.) খাতামান্নাবীঈন, সেখানে এই ইঙ্গিতও দিয়েছেন যে, এই মহিমান্বিত রসূল (সা.) স্বীয় পূর্ণতম আধ্যাত্মিক শক্তির কারণে ঐ সকল সাধু ও পুণ্যবান ব্যক্তিদের জন্য পিতার মর্যাদা রাখেন, যাঁদের পূর্ণ আধ্যাত্মিক বিকাশ তাঁরই অনুবর্তিতার মাধ্যমে সাধিত হয় এবং তাঁদেরকে ঐশী বাণী ও ঐশী বাক্যালাপে ভূষিত করা হয়।"

(রিভিউ বার মুবাহাসা বাটালভী ও চকড়ালবী, পৃ: ৬-৭)

"অতএব, উক্ত অর্থে খোদা তা'লা তাঁকে খাতামান্নাবীঈন বলে আখ্যায়িত করেছেন। অতএব, কিয়ামত পর্যন্ত নির্দিষ্ট ও বিধিবদ্ধ হলো, যে ব্যক্তি সত্যিকার আনুগত্য ও অনুবর্তিতার দ্বারা নিজের উম্মতি হওয়া প্রমাণিত না করবে এবং তাঁর অনুসরণ ও অনুগমনে নিজের সমস্ত সত্তাকে বিলীন না করে এইরূপ ব্যক্তি কিয়ামত পর্যন্ত না কোন পরিপূর্ণ ওহী (ঐশী-বাণী) লাভ করতে পারবে, না পূর্ণ ইলহাম প্রাপ্ত হতে পারবে। কেননা, মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমে 'মুস্তাকিল' (অর্থাৎ অনুবর্তিতা ব্যতিরেকে সরাসরি-স্বাধীন ও স্বতন্ত্র) নবুওয়তের ধারার অবসান ঘটেছে; কিন্তু 'যিল্লি' (প্রতিবিম্ব) নবুওয়ত- যার অর্থ এই যে, কেবলমাত্র মুহাম্মদী ফয়েয ও কল্যানের দ্বারা ওহী পাওয়া কিয়ামত কাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, যাতে আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা লাভের দ্বার রুদ্ধ না হয় এবং যাতে এ চিহ্নটি

শেষাংশ ৮ এর পাতায়.....

যুগ ইমামের বাণী

"পরনিন্দা ও পরচর্চা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে বিরত রাখা উচিত।"

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৪০৭)

দোয়াপ্রার্থী: আব্দুস সালাম, জামাত আহমদীয়া নারার ভিটা (আসাম)

যুগ ইমামের বাণী

যখন তোমরা এক ও অভিন্ন সত্তার ন্যায় হবে, তখন বলা যাবে যে তোমরা আত্ম-সংশোধন করেছ।

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৪০৭)

আব্দুর রহমান খান, জেনারেল ম্যানেজার (Lily Hotel) গৌহাটি

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir